

2013-14

24/2/15

RADHAMADHAB COLLEGE SILCHAR ESTD-1971

# PATRAPUT

2013-14

Professor In-charge :  
Dr. Debashish Roy  
Editor :  
Dilu Das



**RADHAMADHAB COLLEGE**  
**SILCHAR**





# **Patraput**

Student's College Magazine

Prof-in-charge  
**Dr. Debashish Roy**

Editor  
**Dilu Das**

**Radhamadhab College**  
Silchar-788006, Cachar, Assam.

Session : 2013-14

*Prof-in-charge*

**Dr. Debashish Roy**  
Associate Prof. & HOD  
Dept. - History

*Editor, College Magazine*

**Dilu Das**

*Publisher*

Radhamadhab College, Silchar-6

*Printer*

Silchar Sungraphics, Premtola, Silchar-1

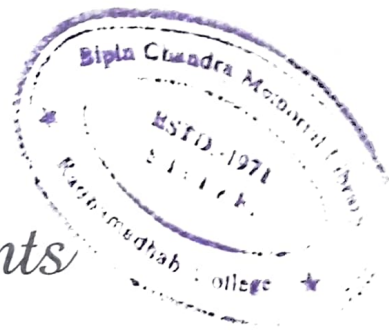
*Members of Editorial Board*

1. **Dr. Prabhat Kumar Sinha**  
(Associate Professor & Head, Department of Political Science)
2. **Dr. Rahul Chakraborty**  
(Associate Professor, Department of Bengali)
3. **Mrs. Arundhati Dutta Choudhury**  
(Assistant Professor, Department of English)
4. **Sri Arunabha Bhattacharjee**  
(Assistant Professor, Department of English)
5. **Dr. Abhijit Choudhury**  
(Part-time Lecturer, Department of Bengali)

The opinion expressed by our contributors are their own and do not necessarily reflect the official views of the Magazine Committee of Radhamadhab College, Silchar.

*Professor-in-charge*

# Contents



2

● College Song	5
● From the Desk of the President, Govering Body	7
● From the Desk of the Principal	9
● From the Desk of the Professor in Charge	10
● From the Desk of the Editor, College Magazine	11
● From the Desk of the General Secretary of the Students Union	12

## ❖ English Section

### Prose

● India was not with Asia in the geologic past —Santosh Goala, (2 <sup>nd</sup> Sem.)	13
● The Statue of Liberty —Shubro Banik (6 <sup>th</sup> Sem.)	14
● Sharing a few thoughts —Kayser Ahmed Khan (2 <sup>nd</sup> Sem.)	15

### Poetry

● The Unnamed Emotion —Dipika Singha (6 <sup>th</sup> Sem.)	16
● Life is a Roller Coaster —Kayser Ahmed Khan (2 <sup>nd</sup> Sem.)	16
● Do Mistakes —Promith Bhattacharjee (2 <sup>nd</sup> Sem.)	17
● If... —Arpan Das (2 <sup>nd</sup> Sem.)	17
● Thoughts —Gaigui Rongmei (4 <sup>th</sup> Sem.)	17

## ❖ বাংলা বিভাগ

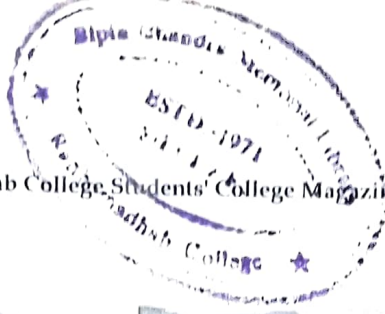
### গদ্য

● আশা, সংগ্রাম ও আত্মবিশ্বাস —দীপাশিতা দাস (৪র্থ সেমিস্টার)	18
● করুণাময়ী মাদার টেরিজা —বিপ্লব ঘোষ (৪র্থ সেমিস্টার)	19
● হৃদয় চুরি —অনুলেখা দেবরায় (উচ্চতর মাধ্যমিক, প্রথম বর্ষ)	20
● মনের পরিচালনা —পূর্ণিমা দেবনাথ (৪র্থ সেমিস্টার)	21
● আসামের জাতীয় পশু : অস্তিত্বের সংকট —অলক বণিক (৪র্থ সেমিস্টার)	22
● বোকা ছেলের বুদ্ধি হল —সাহানাজ বড়ভূঁইয়া (৪র্থ সেমিস্টার)	23
● লোককথা : সমুদ্রের জল লবণাক্ত —সোয়েতা ভট্টাচার্য (উচ্চতর মাধ্যমিক, প্রথম বর্ষ)	24
● দেবদেবীর বাহন ও সাথীরূপে জীবজন্তু — প্রসেনজিৎ দেব (৪র্থ সেমিস্টার)	25
● স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতীয় অস্পৃশ্যতা বিরোধী : আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও তার পেক্ষাপট —দেবরত দাস (৬ষ্ঠ সেমিস্টার)	26
● জানা-অজানা —জয়িতা ধর (৪র্থ সেমিস্টার)	29
● বিখ্যাত ব্যক্তিদের বিখ্যাত উক্তি —জয়িতা ধর (৪র্থ সেমিস্টার)	29
● একটু হাসো —প্রসেনজিৎ দেব (৪র্থ সেমিস্টার)	29
● কিছু জানার কথা —সুপর্ণা সূত্রধর (উচ্চতর মাধ্যমিক, প্রথম বর্ষ)	30
● কিছু জানা কিছু অজানা —সুদীপা দেব (২য় সেমিস্টার)	31
● গুজব খবর —পরিমিতা সাহা (৬ষ্ঠ সেমিস্টার)	32



# Contents

● ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার ঐতিহাসিক রূপরেখা : 'লোকসংস্কৃতির অবস্থান' — দিলু দাস (৪র্থ সেমিস্টার)	33
● বাউল গান : মানবতার গান — মণিদীপা গোস্বামী (প্রাক্তন ছাত্রী)	37
● নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা — রিম্পা দাস (৬ষ্ঠ সেমিস্টার)	42
<b>পদ্য</b>	
● পৃথিবী সৃষ্টির অনুভব — সোনা কংসবণিক (২য় সেমিস্টার)	43
● হৃদয় ক্ষরণ — ভাস্করজ্যোতি দাস (৪র্থ সেমিস্টার)	43
● সময় — দীপাবিতা দাস (৪র্থ সেমিস্টার)	44
● একা — মুনমুন বিশ্বাস (৪র্থ সেমিস্টার)	44
● রূপসী বসন্ত — সুনীল দাস (২য় সেমিস্টার)	44
● অত্যাচারিত নারী — সরস্বতী কংসবণিক (২য় সেমিস্টার)	44
● মোদের এই কলেজ — ইফতিকার আলম বড়লস্কর (৪র্থ সেমিস্টার)	44
● বন্ধু — প্রিয়া পাল (২য় সেমিস্টার)	45
● সপ্ত পুত্রের কাণ্ড — পূজা অধিকারী (২য় সেমিস্টার)	45
● চলবো সবাই মিলে — অনুলেখা দেবরায় (উচ্চতর মাধ্যমিক, প্রথম বর্ষ)	45
● খোলা চিঠি — যোগমায়া দাস (২য় সেমিস্টার)	45
● স্বপ্ন হারা — পুনম বর্মণ (২য় সেমিস্টার)	46
● কৃতজ্ঞতা — রাহুল দে (২য় সেমিস্টার)	46
● শিক্ষক — রিম্পা দাস (৬ষ্ঠ সেমিস্টার)	46
● জননী — সুলতা রাণী দাস (উচ্চতর মাধ্যমিক, প্রথম বর্ষ)	47
● ছন্দহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস — দিলু দাস (৪র্থ সেমিস্টার)	47
● চার মাত্রায় পূর্ণ দু'মাত্রায় অপূর্ণ — ডঃ রাহুল চক্রবর্তী (সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রাক্তন ছাত্র, রাধামাধব কলেজ)	48
<b>❖ হিন্দী</b>	
● मेरी माँ — Kayser Ahmed Khan	49
<b>❖ Radhamadhab College Library : Journal : An Insight Resource</b>	
— Sonali Choudhury Biswas	50
❖ List of the Candidates, who secured highest marks in the Council and University Examination	64
❖ List of Teaching, Library & Administrative Staff	65
❖ List the posts of students Union, Radhamadhab College, 2013-14	67
❖ Name of the Vice-Presidents, General Secretary and Editors of Students Union of Radhamadhab College since 1986	68
❖ Photographs of the various activities of the different cells of the College.	



## কলেজ সঙ্গীত

জীবন জ্যোতি জাগলোরে আজ  
নবীন উষার স্পন্দনে  
আলোর বাঁশী বাজলোরে আজ  
তামসহরন প্রাঙ্গনে।

সত্যশিবে শুদ্ধ হল  
সুস্থ দিনমান

আলোয় আলোয় ধন্য হলো  
নিত্যনব প্রান

বাজে বাজে সেই আনন্দ  
এই মহাশুভ অঙ্গনে

তামসহরন প্রাঙ্গনে।

পথিক যারা শূন্যথাতে

বোধিভিক্ষা মাগে

মানস তাদের তৃপ্ত হল

জ্ঞানদৃশ্ত রাগে

বাজে বাজে সেই চেতনা

এই নবরূপে নন্দনে

তামসহরন প্রাঙ্গনে।

কথা : শেখর পুরকায়স্থ

সুর : শিবানী ব্রহ্মচারী



*Dr. Jagadish Chandra Majumdar*

*M.Sc. (Delhi), Ph.D. (Bombay)*

Retd. Principal, Radhamadhab College, Silchar

Ex-Principal i/c, G.C. College, Silchar

Nag-Naga Lane, Silchar-788004, Assam.

**President**

**Governing Body**

Radhamadhab College, Silchar

Contact No. : 03842-225198 (C)

094350-73666 (M)



Date: .....

**From the desk of the  
President, Governing Body**

*It is a matter of great pleasure that Students' Magazine "Patraput" for the academic session 2013-14 is going to be published very soon.*

*College magazine has got immense importance for the students. It is the one and only medium through which students can cultivate their literary talents by writing poems, articles etc. The College Magazine provides the platform for emergence of the future writers of the society.*

*Further, to highlight the immeasurable impact of the college magazine I would like to request the authority and professor in-charge to take optimum care to encourage the students to participate in the publication of the magazine by way of writing poems, articles etc.*

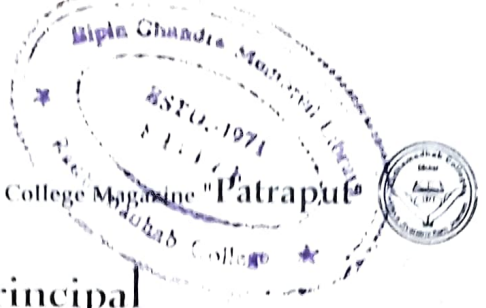
*My best wishes to all members of Radhamadhab College.*

Sd/-

**Dr. J. C. Majumdar**

**President, Governing Body  
Radhamadhab College, Silchar**





Office of the Principal  
**RADHAMADHAB COLLEGE, SILCHAR**

District : Cachar :: Assam :: Pin : 788006

Website : <http://www.rmcollege.org>  
E-mail : [rmcollege71@gmail.com](mailto:rmcollege71@gmail.com)  
E-mail : [rm\\_college@rediffmail.com](mailto:rm_college@rediffmail.com)

Tel. No. 03842-226512, 225198(O)  
03842-264788 (R), 222764 (Lib)  
Fax No. : 03842-225198

Date : 1<sup>st</sup> July 2013



*Foreward*

It is a great pleasure & Pride for me that the students of Radhamadhab College are going to bring out the College Magazine 'Patraput' with a view to exercising their literary skill and exhibit their talents. In promoting the social responsibility, this magazine would reflect the thoughts and views of the teachers & the students to promote the fulfilment of the gospel of the magazine. I firmly believe that their writings will motivate & inspire the younger generation of students in the college.

I would like to express my deep sense of gratitude to the members of the Editorial Board, Teaching and Non-teaching staff of the college for their sincere co-operation and support to make the special issue a success. I am also thankful to Sri Punyapriya Choudhury, Proprietor of Silchar Sungraphics, Silchar for kindly undertaking the task of publishing this Special Issue of 'Patraput'. I hope the articles of the magazine will be able to satisfy the readers of different taste. With these few words I hope that this college magazine will enrich the intellectual stimulations for the greater interest of the students.

  
( Dr. Pronoy Ranjan Deb )  
Principal



## *From the desk of the Professor-in-charge*

It is matter of pride & privilege for me that the students of Radhamadhab College are going to publish their annual college magazine 'Patraput'.

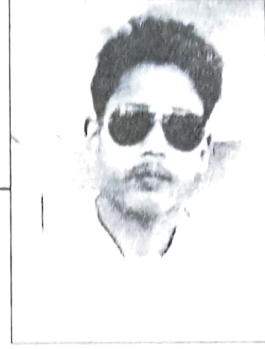
I hope that, this magazine will provide great opportunity for the students to express their skills through their writing ability, like, articles, poems etc.

I also extend my heartfelt thanks to all the members of the editorial board, students, my colleagues and office staff for their generous co-operation. I also express my thanks to our respected Principal for his kind & sincere co-operation.

Lastly, I hope that the endeavour of the secretary for students' magazine & other members of the students union will bring a great success in the field of education for the new generation and inspire them to express their inner views in the form of articles, poems etc. in near future.



**Prof. Debashish Roy**  
Prof-in-charge  
Radhamadhab College



## সম্পাদকের কলমে

ছাত্রজীবনের বিবর্তিত সময়ের পরিসরে নতুন আলো প্রত্যশারও বিবর্তনের ধারা বয়ে চলে এবং এর মধ্যে দিয়েই বিভিন্ন খুঁটিনাটি স্থিতি জীবনে সংগ্রহীত হয়ে থাকে। আর সেই বিভিন্ন জীবনানুভূতির ছোঁয়া, আমাদের 'পত্রপুট' কলেজ মুখপত্রের গঠন শৈলী। তার সাথে ক্ষুদ্র জীবনের সামান্যতম প্রচেষ্টা আমাদের এই পত্রে।

নতুন প্রত্যশা, নতুন চেষ্টা, নতুন অনুভূতির আশা নিয়ে প্রকাশিত হলো আমাদের কলেজের মুখপত্র 'পত্রপুট'। এই নতুনের চেষ্টায় দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ে কিছু বাড়তি চাপ নিয়ে ক্ষুদ্র প্রয়াসের বাস্তব রূপ আমরা ধরিয়ে দিতে চেয়েছি। কল্পনার ছোঁয়া ও বাস্তব বন্ধনের মধ্য দিয়ে।

কাঁচা পাকা হাতের লেখা পত্রিকার অন্যান্য রূপবৈচিত্র্যতা, মননশীলতা, নবসৃষ্টির উল্লাস, কিছু অক্ষুটস্থর, কল্পনার সমন্বয়ই পত্রের বৈচিত্র্যতা। 'পত্রপুটে'র নিবেদিত সংখ্যাটি যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশ গ্রহণে নিরন্তর উৎসাহ দান প্রকাশের আলো পে'ল তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, মাননীয় অধ্যক্ষ প্রণয় রঞ্জন দেব স্যারকে ও 'মুখপত্র' এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক দেবাশিষ স্যারকে এদের অভিজীবকক্ষে 'পত্রপুত্র' সূচুরূপে প্রকাশিত হলো। আমার ছাত্র-সংসদ বন্ধু ও অন্যান্য ছাত্র বন্ধুদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল এবং তাদের প্রতি জানাই ধন্যবাদ যারা সর্বদা আমার পাশে ছিল।

'পত্রপুট'-এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য আরো উজ্জ্বল হবে এই কামনা করি।

দিলু দাস  
সম্পাদক



## সাধারণ সম্পাদকের কলাম

মনে তো পড়ছে অনেক কথাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন পরীক্ষা ব্যবস্থা, পড়াশোনা, আবার তার সঙ্গে ছাত্র রাজনীতি, ব্যাপারটা বড়ই Challenging ছিল। আর এই বয়সে Challenge নেওয়াটাই তো স্বাভাবিক, তাই নিয়ে নিলাম। আর আজ যখন 'সাধারণ সম্পাদকের কলাম' লিখতে বসেছি তো, মনে পড়ছে অনেক কথাই.....

বেশিদিন নয়, কদিন আগেই তো কলেজে এসেছিলাম। সত্যি কথা বলতে প্রথম দিকে একটু ভীতিই ছিল মনে, কিন্তু ধীরে ধীরে সবার ভালোবাসায়, আমি নিজেই জানতে পারলাম না, কখন আমি বদলে গেছি। জড়িয়ে পড়েছি সবকিছুতেই।

যখনই প্রথম এসেছিলাম, তখন কলেজের বারান্দা ক্লাসের পেছনের সারির বেঞ্চগুলোই ছিল বন্ধু। তখন তো আর কেউ ছিল না। ধীরে ধীরে সময় এগিয়ে চলল, আমি, আমার জীবনের এক 'সকাল' এ নিজেকে ছাত্র সংসদ এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আবিষ্কার করলাম। এক অপূর্ব আনন্দ আর সঙ্গে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্যের এই কর্মসম্পাদন কতটুকু সফল বা বিফল, তা ছাত্র-বন্ধুদের কাছেই রইল। তবে সবসময় সচেষ্ট ছিলাম, তা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি।

কলেজের গৌরবময় ঐতিহ্যপূর্ণ মুখপত্র 'পত্রপুট', যা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীলতাকে বিকাশ করে। আর সেই 'পত্রপুট'-এ কিছু লিখছি বলে গৌরব বোধ করছি। মুখপত্র সম্পাদক দিনু দাস কে আন্তরিক ধন্যবাদ।

দায়িত্বসূত্রে সঞ্চিত নানা অভিজ্ঞতা— নানা কাজে, নানা সময়ে আমার বন্ধু-বান্ধবীদের, অগ্রজ অনুজদের সহযোগিতা প্রেম, আর প্রত্যেক স্রগর ম্যডাম এর আশীর্বাদ শুধু আশীর্বাদ নয়, প্রয়োজন শাসন আমাকে হত্ব করেছে। কলেজে অধিকতর কর্মচারীদের বিশেষ সহযোগিতা কি ভোলা যায়? কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়? তাই আমার অব্যক্ত অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা অব্যক্তই থাক।

রাধামাধব কলেজ, ছাত্র সংসদ আর 'পত্রপুট' এর শ্রীবৃদ্ধি ও উজ্জ্বলতা কামনা করি।

তোমাদের  
ভাস্কর জ্যোতি দাস  
সাধারণ সম্পাদক  
রাধামাধব কলেজ, ছাত্র সংসদ





# English Section



## INDIA was not with Asia in the geologic past

**Santosh Goala**

*TDC (2<sup>nd</sup> Semester)*

Some may be shocked to know that in the geological past, India was not with Asia but with Africa. Geological studies have established the fact. About Thirty crores of years back, there was a mega continent comprising all the present oceans which has been named as panthalesa.

About thirty five crores of year back the pamgea broke into two continents the northern continents of Lourasia and the southern continent or Gondwana. India, Africa, Europe, North America and Antarctica were within the Gondwana continent.

Again, Europe North America and Greenland belonged to Laurasia. About twelve crores of years back both Laurasia and Gondwana again broke creating the present continents.

India got separated from Gondwana and started a Northern Journey initially about some cm per year and reached near Asia about six crores of year back. A narrow strip of Oceanic waters then separated India and Asia. That ocean has been named by suess as Tethys. The Himalaya now stands where Tethys sea existed about six crores of year back. The present Mediterrean sea is the remnant of Tethys Sea of the past with the rise of Himalaya from Tethy a sea, India got attached to Asia about five crores of year back.

*(Source: Internet)*





## The Statue of liberty

**Shubro Banik**

*TDC (6<sup>th</sup> Semester)*

The statue of liberty was a joint effort between France and the United states, intended to commemorate the lasting friendship between the peoples of the two nations. The french sculptor Fredric Auguste Bartholdi created the statue out of the sheets of hammered copper, while Alexandre Gustave Eiffel, the man behind the famed Eiffel Tower, designed the statue's steel frame work. The statue of liberty then given to the United states and erected atop an American designed pedestal on a small island in upper Newyork Bay, now known as liberty island, and dedicated by Prendent Grover Cleveland in 1886. Over the years the statue stood tall (305 feet or 93 metres) as millions of immigrants arrived in America via nearby Ellis Island (1986). It underwent an extensive renovation in honour of the centennial of its dedication. Today the statue of liberty remains an enduring symbol of freedom and democracy, as well as one of the world's most recognizable landmarks.

The Statue of Liberty over the years-

Until 1901, U.S Lighthouse Board operated the Statue of Liberty, as the statue's torch represented a navigational aid for sailors. After that date, It was placed under Jurisdiction of the U.S. war department due to fort wood's status as a still operational army post. In 1924 the federal government made the statue a National Monument, and it was transferred to the care of the National Parks service in 1933. In 1956 Bedloe's Island was renamed Liberty Island, and in 1965, more than a decade as a federal immigration station, Ellis Island became part of the Statue of Liberty National Monument.

By the early 20th century, the oxidation of the statue of Liberty's copper skin through exposure to rain, wind and sun had given the statue a distinctive green colour, known as verdigris. In 1984 the statue was closed to the public and underwent a massive restoration in time for its centennial celebration. Even as the restoration began, the United Nations designated the statue of liberty as a World Heritage site. On July, 1986, the Statue of Liberty reopened to the public in a centennial celebration. After the terrorist attacks of September 11, 2001, Liberty Island was closed for 100 days ; the statue of liberty itself was not reopened to visitors, access until August 2004. In July 2009, the statue's crown was again reopened to the public, though visitors must make a reservation to climb to the top of the pedestal or to the crown.





## Sharing a few thoughts

**Kayser Ahmed Khan**

*TDC (2<sup>nd</sup> Semester)*

As a student of Radhamadhab College Silchar I would like to say that when on the first day in Radhamadhab College I entered into T.D.C. 1st sem Class, I felt a sense of thrill and excitement of entering a new world, which would be my guiding light. I am truly grateful as a student of this college, because even now after months have passed, I still feel that and would learn some thing new and valuable when stepping into college campus every morning. Just as morning shows the day, the students entry in Radhamadhab College shows their bright future. We come to college not only for education but also for other co-curricular activities and normal values. The teachers' work a lot for the students' betterment in studies with care and devotion and help to have right attitudes. And I would like to say that as a student, I would like to respect each and every one in the college.

Again, I would like to say that as a student, I would respect each and everyone including the junior classmates and other staff of my college besides teaching staff. And as I desire to spread the name of my college, and being a student of the college would give special attention to see that there is no indiscipline in the college campus and every thing is going well in its order following the rules and regulations. At last, I would like to promise that I myself will not break the discipline of the college by doing any sort of mischief that would defame my reputed college and bring disgrace to myself.





## The Unnamed Emotion

Dipika Singha  
*TDC (6<sup>th</sup> Semester)*

The crying faces that emerge  
In front, with pale, husky  
Murmur. The dying sound  
Of humanity wakes an  
Unnamed emotion

Methink, the world wonder  
But Wnsteady, winning desire  
Devours the pure.

Unsettled thoughts and lurking  
Darkness, tainting the insides  
Of my 'Self'.

Oh! What pain, What fear  
That I feel is compared to it.  
The Karma has to be paid  
The Shaking believe has  
To be strengthened.



## Life Is a Roller Coaster

Kayser Ahmed Khan  
*TDC (2<sup>nd</sup> Semester)*

Life is a roller coaster  
Full of ups and downs  
Passes through light and dark,  
As it proceeds,  
High up there  
Its thrilling to be-  
Frightening though it is,  
But holding their hands,  
On the smooth soon are we  
But when this ends,  
We don't realise,  
We hold them light again.  
And passing through the dark,  
Crossing the tunnel,  
We are fine again,  
While, coming out,  
They ask us now  
Enjoyed, did you?"  
And we reply smiling  
Wont to be there again,  
Rolling around with you two."





If .....

**Arpon Das**

*TDC (2<sup>nd</sup> Semester)*

If you want to kill  
Kill your pride  
If you want to correct  
Correct your mistakes,  
If you want to sow  
Sow seeds of hope,  
If you want to help  
Help the needy  
If you want to cultivate  
Cultivate good habits.  
If you want to fight  
Fight for justice and  
If you want to die  
Die for your nation.



## DO MISTAKES

**Promith Bhattacharjee**

*TDC (2<sup>nd</sup> Semester)*

Do Mistakes sometimes,  
To learn something good  
But don't do it yourself,  
Let it be done by its own.

A cup is broken,  
Don't worry, you are now careful.  
But if you do it again,  
Remember then you are a fool.

You have killed a bird,  
But don't tell a lie  
But when you are going to do it again,  
Remember they have far to fly.

Do different mistakes,  
But don't repeat them again  
When you do mistakes,  
Remember you have something to gain.





## Thoughts

Gaigui Rongmei

*TDC (4<sup>th</sup> Semester)*

Life is just an endless stream of experience.  
Hope is like a lamp glowing in the  
darkness, despair is like the darkness  
Surrounding it.

Life is just an endless dream of mind  
Today belong to us, yesterday is dead  
And tomorrow is not yet born,  
Respect and love are the keys to good  
Behaviour.

The second golden rule is to take care  
Of the book.

If you are warm and loving, people will  
Be attracted to you.

Time is like a river you cannot touch  
The same water twice because the flow  
That has passed will never pass again.





# বাংলা বিভাগ

গদ্য

## আশা, সংগ্রাম ও আত্মবিশ্বাস

দীপাঙ্কিতা দাস

টি.ডি.সি. (চতুর্থ সেমিস্টার)

জীবন আছে তো সংঘর্ষ আছে। সংঘর্ষ আছে মানে জয় পরাজয় আছে। মানুষের জীবনই সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু কোন মানুষের জীবনে যদি দুঃখই থাকে তবে তার হাল ছাড়া উচিত নয়। জীবনে তাকে যুদ্ধ করে এগিয়ে যেতে হবে ভবিষ্যতের দিকে এবং সেই যুদ্ধে তার প্রধান অস্ত্র হবে আশা। কারণ আশাকে কেন্দ্র করেই জীবন। জীবনের এই দুঃখকে কাটিয়ে উঠতে আশার ছোট কিরণই হবে তার প্রধান শক্তি। কারণ আমরা জানি অন্ধকারের পর আলো আসবেই। আর সেই ঘন কালো রাত্রির পর হবে সূর্যোদয়।

জীবন পথে এগিয়ে যেতে হলে আরেকটি জিনিস থাকা প্রয়োজন তা হল আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস না থাকলে আমরা যদি কোন অসুবিধায় পড়ি তাহলে সেই অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারব না। জীবনে কিছু পেতে হলে আমাদের তো সংগ্রাম করতেই হবে, কিছু হারানোর ভয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাস হারানো উচিত নয়। আমরা হারব কি জিতব সেটা আমরা পরে জানব কিন্তু আমাদের প্রথম থেকেই মনোবল ভাঙা উচিত নয়। সূর্য অস্ত হওয়ার পর আমরাও যদি ভাবি যে সূর্য উদয় আর হবে না তাহলে সংসারে কোন মানুষই বাঁচতে পারবে না। জীবনে বাঁচতে হলে, জীবনপথে অগ্রসর হতে হলে আমাদের আশার প্রদীপ নিজেই জ্বালিয়ে দিতে হবে। তাহলেই আমরা জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারব।

একটি ছোট শিশু তার বাল্যকাল কাটিয়ে দেয় খেলাধুলার মাধ্যমে। তখন তার মনে কত স্বপ্ন থাকে। কিন্তু স্বপ্ন পূরণের জন্য তার আত্মবিশ্বাস থাকা অতি আবশ্যিক এবং তাকে সেই স্বপ্ন পূরণ করার জন্য করতে হবে কঠোর পরিশ্রম। আর তা না হলে জীবনপথে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে। জীবনে নিজের কাজ নিজেই করতে হবে। তাহলেই আমরা জীবনে সহজপথ খুঁজে নিতে পারব এবং নিজের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারব।

কোন কোন মানুষ জীবনে কিছু পাওয়ার জন্য খারাপ পথে চলে যায় বা খারাপ সঙ্গের কবলে পড়ে যায়। তাই এদিকে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জীবনে কিছু পেতে হলে বা জীবনের কোনো উদ্দেশ্যকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য আমাদের সর্বদা সৎ পথেই চলা উচিত। কারণ যদি আমরা জীবনে খারাপ পথ বেছে নিই তাহলে তার ফলটাও খারাপ হবে। আর আমরা যদি সৎ পথে চলি তাহলে আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে ঠিকই, কিন্তু তার ফলটা সেই পরিশ্রমের তুলনায় হবে অনেক বড়।

জীবনে সংগ্রাম করতে হবে আমাদেরকে একটি জরুরি কথা মনে রেখে তা হলো সাহস। আমাদেরকে সাহসী হতে হবে। ভয় নামক শব্দটি আমাদের মন থেকে মুছে নিতে হবে। কারণ ভয় আমাদেরকে সর্বদা পরাজয়ের রাস্তা দেখাবে। জয় পেতে হলে আমাদের সাহসী হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। জীবনে সত্য কথা বলতে হলেও আমাদের সাহসের প্রয়োজন। এবং প্রত্যেক মানুষেরই সত্য কথা বলা উচিত সত্যের পথে চলা উচিত। সত্যই আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া দরকার।





## করুণাময়ী মাদার টেরিজা

বিপ্লব ঘোষ

টি.ডি.সি. (চতুর্থ সেমিস্টার)

১৯১০ সালে ২৭শে আগস্ট যুগোস্লাভিয়ার স্কোপজে শহরের এক অ্যালবেনীয় দম্পতির ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাল্য নাম ছিল অ্যাগনেস গংক্সা বোজা স্কাউট।

ছোটবেলা থেকে অসহায় মানুষের কষ্টে প্রাণ কাঁদত। তিনি আর্তের আত্মীয়, গরীবের বন্ধু। ১৯২৮ সালে মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি মা, বাবা, ঘর-বাড়ি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সবাইকে ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। কলকাতা শহরেই প্রথম দুইর সোবাস্রম আরম্ভ করলেন মাদার অনাথ শিশুদের জন্য অনাথ আশ্রম, বস্তি দরিদ্র শিশুদের জন্য স্কুল। অসুস্থ মৃত প্রায় বৃদ্ধদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম আর কুষ্ঠ রোগীদের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। মাদার টেরিজা। তিনি বলতেন, ঘৃণা নয় সেবা, ভালোবাসা একজন কুষ্ঠ রোগীকেও সুস্থ করে জীবনের কূলে ফিরিয়ে নিয়ে এসে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। “Touch a leper, touch him with love” এখানেই স্নেহময়ী জননীর স্নেহের সীমাহীনতা। মাদার টেরিজা কখনও নাম বা যশের জন্য নিজে কাজ করেননি। অসহায়ের পাশে দাড়িয়ে অক্লান্ত সেবা করে, আত্ম তৃপ্তি পেয়েছেন। মাদার টেরিজা শুধু এ দেশের নয় সারা বিশ্বের মাদার। আর্তের সেবার জন্য নিজের সব কিছু ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

“যত্র জীব তত্র শিব” অর্থাৎ “যেথায় জীব সেথায় শিব” সেবা করা আমাদের পরম ধর্ম। কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষের মুখে একই কথা— ‘সময় নেই’ এর উত্তরে বোঝা যায় যে আমরা সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি না, অন্তহীন সময় বয়ে যায় নদীর স্রোতের মত ইংরাজিতে একটি কথা আছে Time and Tide wait for none আবার অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই ‘কাল করব’ পরে করব’ বলে কাজ ফেলে রাখে। তাদের এই প্রবণতার মূলে রয়েছে আলস্য কিন্তু দুঃখের ব্যাপার ভারতীয়দের মধ্যে রয়েছে বড় সময়ের অভাব। কিন্তু মাদার টেরিজা কোন সময়ও নিজের কথা সময়ের কথা বা আর্থিক অবস্থার কথা ভাবতেন না। একবার তিনি আশ্রয় একটি ‘শিশুভবন’ তৈরি করতে গিয়ে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন। টাকার সম্ভাবনা কিছুতেই হচ্ছিল না। ওই সময় তাকে ‘ম্যাগসেস’ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। পুরস্কারের পুরো টাকাটাই তিনি শিশু ভবন নির্মাণের কাজে পাঠিয়ে দেন। ভারত সরকার তাঁর কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ১৯৭১ সালে তিনি পেয়েছেন— “পোপ ত্রয়োবিংশ শান্তি পুরস্কার” “গুড সামারিটান পুরস্কার”, “কেনেডি আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার”, “ডক্টর অব হিউম্যান লেটার্স” উপাধিতেও তিনি ভূষিত হয়েছেন। ১৯৭২ সালে তিনি পেয়েছেন “নেহেরু পুরস্কার”। ১৯৭৩ সালে তিনি পেলেন “টেম্পেলটন ফাউন্ডেশন প্রাইজ ফর ইন্টারন্যাশনাল আণ্ডার স্ট্যাঞ্জি”। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে পেলেন “নোবেল পুরস্কার”। ১৯৮০ সালে ভারত সরকার তাঁকে ভূষিত করেন ভারত রত্ন উপাধিতে আর এই স্নেহ করুণাময়ী প্রতিমূর্তি মাদার টেরিজা ১৯৯৭ সালে ৫ সেপ্টেম্বর সমস্ত বিশ্ববাসীকে মাতৃহারা করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

“অনাথ করলে তুমি আমাদের হে বিশ্ব জননী”

(The life and work of Mather Teresa Author : Paul Williams, 2002-Alpha publisher.)





## হৃদয় চুরি

অনুলেখা দেবরায়  
উচ্চতর মাধ্যমিক (প্রথম বর্ষ)

সে অনেকদিন আগেকার কথা। একদেশে এক রাজা ছিলেন। রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, অনেক পাত্র-মিত্র, মন্ত্রী-সেপাই ছিল। কিন্তু রাজার মনে বড় দুঃখ — তাঁর কোনও ছেলে ছিল না। ছিল শুধু একমাত্র মেয়ে। রাজকন্যা রূপকুমারী। রাজা ওকে ঠিক রাজপুত্রের মতই সব ব্যাপারে পারদর্শী করে তুলতে লাগলেন।

ওদিকে রাজ্যের পাশে বনের ধারে এক বৃদ্ধা তার একমাত্র নাতিকে নিয়ে থাকতেন। নাতি বনে বনে ঘুরে যা পেত তাই বাজারে বিক্রি করে ওদের দিন যেত। এভাবে চলতে চলতে একদিন বৃদ্ধা ঠাকুমা মারা গেলেন। নাতি পলাশ কী করবে ভেবে ভেবে সে জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল অজানার উদ্দেশ্যে। চলতে চলতে সে সেই মজার রাজ্যে এসে পৌঁছল। কোথায় যাবে কোথায় পাবে চিন্তা করতে করতে পথের ধারে গাছতলায় কোনও মতো রাত কাটাল। পরের দিন ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সে এক মুদির দোকানে গেল। সেখানে কোন কাজ পায় কিনা তার জন্যে। কিন্তু মুদিওয়ালা ওকে কোনও কাজ দিতে রাজি হয় না, ভিনদেশী মানুষকে কাজে রাখবে না বলে ওকে বিদায় করে দিল। এভাবে মিস্ট্রির দোকান, কাপড়ের দোকান, অনেক দোকান ঘুরেও কাজ পেল না।

পরদিন সে রাগে দুঃখে ভাবল আমাকে যখন এখানকার কেউ কাজ দিতে চাইছে না তখন আমি রাজার বাড়ি চুরি করব। সে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এসে দেখল দারোয়ান আফিং খেয়ে বেহুস হয়ে দুয়ারের এক পাশে পড়ে আছে। সে নিঃশব্দে দারোয়ানকে পেরিয়ে ঘরে এল, ভাবল আজ যা কপালে আছে সব কিছু চুরি করে নিয়ে যাব। ঘরে ঢুকে দেখে দুটি সোনার পালঙ্কে রাজা-রাণী শুয়ে আছেন। পাশের ঘরে ফুলের মত রাজকন্যা রূপকুমারী। ধীরে ধীরে সাবধানে পা ফেলে চাবি খুঁজতে লাগল, খুঁজতে খুঁজতে রাজার বালিশের তলায় চাবি পেল।

চাবি নিয়ে খুব সন্তর্পণে লোহার সিন্দুক খুলল। সে অবাক হয়ে দেখতে লাগল কত মণি, মুক্তা, হীরে, জহরত। তাছাড়া রাণীমার গজমতির হার, হীরে মতির মালা, মুক্তা বসানো কানের দুল। এগুলি চুরি করে দূরদেশে নিয়ে বিক্রি করলে অনেক টাকা পাবে। কিন্তু নিতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল; ভাবল আমি যদি ওগুলো নিয়ে যাই তবে রাজা দেশ কিভাবে চালাবেন। না, আর নেওয়া হল না। সে আবার চুপি চুপি বেরিয়ে গেল পথে। ভাবল, সে আবার ঠাকুমার বনেই চলে যাবে এবং আগের মত চলবে ভেবে গাছতলায় শুয়ে পড়ল, ভাবল ভোর হলেই চলে যাবে।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই দেখল অনেক মানুষ তাকে ঘিরে রেখেছে। পাশে সেপাই এবং রাজা স্বয়ং। সেপাই ওকে জাগতে দেখে বলল, “এই ছেলে, তাকে রাজামশাই ডাকছেন” — সে কাঁপতে কাঁপতে রাজা মশাইকে বলল — আমি তো চুরি করিনি রাজামশাই, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি এ দেশ থেকে চলে যাব।

রাজা ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন কাল রাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি সব দেখেছি। তো, আমি ঠিক করেছি আমার একমাত্র মেয়ে রূপকুমারীকে তোমার মত সৎ ও সাহসী ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব।

তারপর এক শুভদিনে শুভক্ষণে রাজকন্যা রূপকুমারীর সাথে পলাশের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েতে রাজ্যের সবার নেমন্তন্ন ছিল।





## মনের পরিচালনা

পূর্ণিমা দেবনাথ

টি.ডি.সি. (চতুর্থ সেমিস্টার)

মনকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতা মানব প্রকৃতিতে স্বল্প মাত্রায়। কিন্তু এই ক্রটিপূর্ণ মনটিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে মানুষকে একটি উপায় অবলম্বন করতে হবে স্বামীজির আদর্শ। একটি মানুষ সম্পূর্ণ তখনই গড়ে উঠবে যখন সে সত্যকে অনুসরণ করে চলবে জীবনের প্রতিটি পথে। স্বামীজী বলেছেন, সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোন কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। যে মানুষ সৎ নয় অর্থাৎ অসৎ প্রকৃতির, সেই মানুষটি সমাজের যোগ্য নয়, সে জন্যই স্বামীজী বার বার করে বলেছেন, মানুষ যদি সৎ ও যোগ্য হয়, তাহলে যে কোন সমাজব্যবস্থাই সার্থক হয়ে ওঠে। যথাসাধ্য মতো সবাই নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করে, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে সেই চেষ্টাতে মিশ্রিত থাকে অপরের অনিশ্চয়তা। আমরা কি অপরের অনিশ্চয়তা না করে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি না? এইটুকু যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাস কি আমরা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারি না। স্বামীজী তাঁর বাণীতে বলেছেন যে— ‘এগিয়ে চলো, নিজের লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামো না।’ আমরা সৎ মনোভাব ও আত্মবিশ্বাসের সহিত যদি শপথ করি যে আমরা থামব না নিজের লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত। তবে আমরা একদিন নিজের লক্ষ্যে নিশ্চয়ই পৌঁছব।

অন্য ব্যক্তির মনটিকে যদি আপনার নিজের বলে ধরে নিই ; সেই ব্যক্তিটিকে ঘাত প্রতিঘাতের অন্ধকার থেকে দূরে নিয়ে আলোর প্রদীপে প্রজ্বলিত করি, তবেই আমরা নিজেকে সার্থক বলে মেনে নিতে পারি। ইচ্ছাশক্তি, চিন্তাশক্তি, মানবিক শক্তি, বিবেক শক্তি ও ধৈর্যশক্তি ইত্যাদি শক্তির মতই মনঃশক্তিও আমাদের মধ্যে আছে, কিন্তু আমরা এই শক্তিকে কাজে লাগাতে চাই না। অতএব এই বৃহৎ মূল্যবান শক্তি আমাদের কাছে অপরিচিত। কেন শুধু মানুষের মধ্যে মানুষের জন্য ঈর্ষা, হিংসা, প্রতিশোধ নেওয়ার ভাবনা এবং অন্যের অপকার করা প্রভৃতি মনোবৃত্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমরা চাইলে তো নিশ্চয়ই পারি এই সব কুচিন্তা, কিংবা কু-কর্ম না করে নিজের ও অন্যের উপকার করা। আমরা কেন চেষ্টা করি না স্বামীজীর আদর্শে একটু চলার। যদিও পারি না বড় বড় স্বার্থ ত্যাগ করতে কিন্তু ছোট ছোট স্বার্থ তো ত্যাগ করতে পারি। পারি অসহায়, দুর্বলকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে।

ভগবদ্গীতাকার বলেছেন, অসংযত মনই আমাদের শত্রু। কিন্তু যে মন সংযত, তা আমাদের বন্ধুর কাজ করে থাকে। অতএব, আমাদের মন কিভাবে কাজ করে থাকে, সে সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। আমরা বর্তমান প্রজন্মের যুবক-যুবতীরা কি মনকে এমনভাবে গড়ে তুলতে পারি না যাতে আমাদের মন সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে?





## আসামের জাতীয় পশু : অস্তিত্বের সংকট

অত্র বণিক

টি.ডি.সি. (চতুর্থ সেমিস্টার)

চা এবং বিহু নাচ আসামের পরিচয়কে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছে। দেশের ভেতরে তো বটেই, বাইরেও আসামের চায়ের কদর বেড়েই চলেছে। আর বিহু-নাচ আসামের এই একান্ত আপন নৃত্য-শৈলীকে ঘিরে বিদেশীদের মধ্যে ও উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। বহাগ বিহুর সময় লগুন, আমেরিকা কিংবা কানাডায় প্রবাসী অসমিয়াদের বিহু সম্মেলনে সাহেবরাও কোমর দোলান। চা, কিংবা বিহু নাচের বাইরেও বিশ্বের মাঝে আসামকে যে গর্বের আসনে বসিয়েছে তা হল, একখন্ডা বিশিষ্ট গণ্ডার। লুপ্ত প্রায় এই গণ্ডারের জন্যই পৃথিবীর পর্যটন মানচিত্রে জ্বল জ্বল করছে অসমের নাম। বিরল এই প্রাণীটিকে দেখার টানেই প্রতি বছর হাজার হাজার বিদেশি পর্যটক সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে কাজিরাঙায় আসেন। বিশ্বের ৯৫ শতাংশ একশৃঙ্গ গণ্ডারের বাস এই আসামের কাজিরাঙা, পবিতরা, ওরাং অভয়ারণ্যের গহন জঙ্গলে যাদের বাস। বিরল প্রজাতির একশৃঙ্গ গণ্ডারের জন্যই ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য স্থানের (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট) মর্যাদা পেয়েছে কাজিরাঙা।

গোলাঘাট, নগাঁও ও শোণিতপুর জেলার ৪৩০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তীর্ণ এই জাতীয় অভয়ারণ্যের গণ্ডারগুলো এখন অস্তিত্বের ভয়াবহ সংকটে। চোরা শিকারীদের দাপটে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে আসামের ঐতিহ্য। জাতীয় সম্পদ একশৃঙ্গ বিশিষ্ট গণ্ডারের উপর চোখ পড়েছে আন্তর্জাতিক চোরাশিকারীদের। যার ফলে তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছে। চোরাশিকারীদের হাতে গণ্ডার ব্যাপক হারে নিধনের ঘটনা পরিবেশবিদদের ও উদবিগ্ন করে তুলেছে। গত বছরের শুরু থেকে নিরীহ এই প্রাণীটির উপর রাক্ষুসে চোরাশিকারীদের আক্রমণ অতীতের সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। গত ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে দুষ্কৃতীদের যে আক্রমণ চলেছে, গত বছর তা বহুগুণ বেড়ে গেছে। ঘাতকদের কোপদৃষ্টি থেকে রেহাই মিলছে না আপাত নিরীহ এই প্রাণীটির। গত বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত মাত্র আট মাসে চোরাশিকারীদের আক্রমণে ২৯টি গণ্ডার অত্যন্ত নৃশংসভাবে প্রাণ হারিয়েছে। কখনও প্রাণে মেরে, কখনও বা জীবিত গণ্ডারকে আহত করে খন্ডা কেটে নিয়ে পালিয়ে যায় আততায়ীরা, মৃত্যুর যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অবশেষে চরম কষ্ট পেয়ে কত গণ্ডারের যে প্রাণ গেছে তার হিসাব নেই। তার দুর্লভ শৃঙ্গের দিকে লোলুপ দৃষ্টি। তাই জীবন দিয়ে দুর্বৃত্তের চাহিদা পূরণ করছে বিরল প্রাণীকুল। দুর্বৃত্তের গুলিতে গুরুতর জখম হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় যখন কোনো গণ্ডার ছটফট করে। তারপর তার মূল্যবান শৃঙ্গটি কেটে নিয়ে যায় খুনে দানবরা। ধারলো অস্ত্র দিয়ে খন্ডাটি কেটে ফেলার রক্তে ভিজে যায় আশপাশ। ভাষাহীন পশুর অব্যক্ত বেদনার প্রকাশ পায় তার চোখের জলে। নির্বাক কান্নায় সে যেন বলতে চায়, মানুষ এত নিষ্ঠুর! লোভের বশে বনের পশুকে তিলে তিলে মৃত্যু যন্ত্রণায় ঠেলে দিতে যার হাত কাঁপে না একবারও। মানুষ নামক জীবের আকাশছোঁয়া লোভের বলি হয়ে জীবন উৎসর্গ করে দেয় বনের পশু, যে কিনা একটি রাজ্যের প্রতীক, জাতীয় গর্ব। মানুষের আকাঙ্ক্ষার গণ্ডারের করুণ মৃত্যুর এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য একবার, দুবার নয়, বার বার দেখেছেন এ রাজ্যের মানুষ। আর নিরাপত্তারক্ষী, সরকারের প্রতি উচ্চারিত হয়েছে শুভবুদ্ধির মানুষ, আর প্রকৃতি প্রেমীর ধিক্কার। এ যেন সীমাহীন লোভের কাছে সরকারের অসহায় আত্মসমর্পণ।

আসামের বিশ্ববিখ্যাত একশৃঙ্গ গণ্ডার বাঁচাতে বিভিন্ন সময় পথে নেমেছে বিভিন্ন সংগঠন, বুদ্ধিজীবী মহল এবং সরকারও কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আগামীকাল আমরা কেমন সমাজ গড়ব, তার নির্দেশ পেতে গেলে গতকালের কাছে আমাদের অনেক প্রশ্ন নিয়ে যেতেই হবে। এই সম্পদ রক্ষার উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা না করলে আগামী দিনে হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই প্রাণীটি। সেই সঙ্গে আসামের এক ঐতিহ্যের অকালমৃত্যু ঘটবে, আর যার দায় এড়াতে পারবে না আসামের জনগণও।





## বোকা ছেলের বুদ্ধি হল

সাহানাভ বড়ভুইয়া  
টি.ডি.সি. (চতুর্থ সেমিস্টার)

অনেক দিন আগের কথা। কোনো এক দেশে এক বোকা ছেলে থাকত। সে এতই সরল ও সোজা প্রকৃতির ছিল যে অনেক সময় অনেক ঘটনা ঘটে গেলেও বুঝত না সেটা গুরুত্বপূর্ণ কী না। একদিন রাত্রিবেলা সে বাইরে হাঁটতে বের হয়ে লক্ষ্য করল আকাশের চাঁদটি ও তার সঙ্গে হাটছে। সে মনে মনে ভাবল আমি চাঁদটাকে হঠাৎ ধরে নিয়ে সৌভাগ্যবান হয়ে যাব। যেমন চাঁদটি মেঘের শুঁড় থেকে বের হয় তেমনি সে হাঁটতে আরম্ভ করে। বার বার চুপি চুপি দেখছে চাঁদ ওর সঙ্গে সঙ্গে আসছে কী না। কিছু দূরে একটি কুয়ো ছিল, সে সামনে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে, আরে চাঁদ কীভাবে আমাকে টপকে নীচে নেমে গেল। সে মনে মনে বলল দাঁড়ারে চাঁদ। তাকে মজা দেখাচ্ছি। ছেলেটি কুয়ার মধ্যে লাফ দিয়ে চাঁদ ধরতে গেল। কিন্তু জলে হাবুড়ু বু খেয়ে বিপদে পড়ে চিৎকার শুরু করল।

—বাঁচাও। বাঁচাও।

সেই সময় কুয়ার পাশের রাস্তা দিয়ে পুলিশ যাচ্ছিল। সে চিৎকার শুনে পাশে এসে দেখল আরে! এ তো দেখি একটি ছেলে কুয়োতে পড়ে গেছে। পুলিশ ছেলেটিকে কুয়ো থেকে উদ্ধার করে জানতে চাইল—

—বল তো, তুমি কী করে গেলে কুয়োতে?

ছেলেটি বলে— কুয়ার মধ্যে আমি চাঁদকে দেখে লাফ দিয়েছিলাম।

তখন পুলিশটি ছেলেটিকে বুঝিয়ে দিল, কুয়ার তরঙ্গহীন জলে তুমি চাঁদের ছায়া দেখেছ। চাঁদকে ধরে বড়লোক বা সৌভাগ্যশালী হওয়া যায় না। চন্দ্র সূর্য প্রকৃতির নিয়মে চলে বলেই আমাদের জীবন বেঁচে থাকে। আর কোনও দিন এরকম ভুল করবে না, রাত্রিবেলা এসে বের হবে না। তুমি আজ যা করেছ তা মারাত্মক ভুল।

বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে ছেলেটি বুকল এবং শিখল যে, বোকার মত চললে জীবনে প্রতিপদে বিপদে পড়তে হয়। তারপর থেকে ছেলেটি মন দিয়ে পড়াশোনা করে সঠিক চিন্তা করা শিখল। ধীরে ধীরে বুদ্ধিমান হয়ে উঠল।







## লোককথা : সমুদ্রের জল লবণাক্ত

সোয়েতা ভট্টাচার্য  
উচ্চতর মাধ্যমিক (প্রথম বর্ষ)

একটি গ্রামে দুই-ভাই নিজেদের পরিবারের সাথে থাকতো বড় ভাই ধনী এবং ছোট ভাই গরীব ছিল। কালীপূজা আসায় সকল গ্রামের লোকেরা আনন্দে বাজি ফোটাচ্ছিল। কিন্তু ছোট দারিদ্র ভরা জীবনে নিতান্তই খাওয়ার অভাবের মধ্যে বাজি ফোটাতে এমন যোগ্যতা নেই তার। এই উৎসবে ভাইয়ের যথার্থ সাহায্য প্রার্থনার জন্যে ছোট ভাই বড় ভাইয়ের ঘরে গেল। কিন্তু সেখানে সাহায্যের বদলে মিলল গালি-গালাজ এবং অত্যাচার। সেখান থেকে দুঃখিত হয়ে বেরিয়ে আসে এবং তখন এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বয়স্ক লোকটি তখন ছেলেটিকে তার দুঃখের কথা জিজ্ঞেস করে, এবং সবকিছু জানার পর ছেলেটিকে সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দেয়। তবে তার আগে ছেলেটির কাছে একটি শর্ত রাখে; শর্তস্বরূপ ছেলেটি বুড়োর কাঁধের লাকড়ির আঁটি নিজের ঘাড়ে করে পৌঁছে দেয়। এবং সাহায্য স্বরূপ ধনী হওয়ার পন্থাটি বলে দেয়, তখন বুড়ো ভদ্রলোকটি বেশ কয়েকটি পিঠা তার হাতে তুলে দেয়, এবং নির্দেশ মত কাজ করে যায় ছেলেটি।

বুড়ো ভদ্রলোকের নির্দেশানুক্রমে, ঘর থেকে বেরিয়ে উত্তর দিক হয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়, একে একে তিনটি গাছ দেখতে পায়, সেই গাছের পাশ কেটে চলে যায় একটি পাহাড়কে লক্ষ্য করে; এবং সেই পাহাড় লক্ষ্য করে একটি গুহায় ঢুকে যায়, এবং সেই গুহায় ঢুকে এক ব্রাহ্মণের সাথে দেখা হয়; এবং বুড়োর নির্দেশানুক্রমে ব্রাহ্মণটিকে পিটে দিয়ে বর প্রাপ্ত হয়। সেই বর হিসেবে একটি 'চক্কি' প্রাপ্ত হয়। এবং তখন ব্রাহ্মণ চক্কির গুণাগুণ বলে দিয়ে ছেলেটিকে বিদায় করে। চক্কি নিয়ে ছোট ভাই ঘরে পৌঁছল। এবং ব্রাহ্মণের কথা মত, চক্কি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলে, "চক্কি চক্কি চাবল নিকাল" যখন চালের ঢের লাগতে শুরু হল তখন একসময় লাল কাপড় দিয়ে চক্কিকে ঢেকে দিল। কিছুসময় পর আবার চক্কির লাল কাপড় সরিয়ে চক্কি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে থাকে, "চক্কি চক্কি ডাল নিকাল"। একসময় ডালের ঢের যখন লাগতে শুরু করল তখন আবার লাল কাপড় দিয়ে চক্কি ঢেকে দিল। এবং সেদিনকার মত চক্কি ঢেকে রেখে ক্ষুধার্ত স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলই আনন্দে খেয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। যেগুলো ডাল চাল বেচে ছিল পরের দিনের খাবারের জন্য রেখে বাকি সব বিক্রি করে দিল বাজারে নিয়ে। ঘরে এসে সেভাবেই আবার চাল, ডাল এবং অন্যান্য জিনিস চক্কি ঘুরিয়ে বের করতে লাগল। এবং ঘরের প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিস রেখে বাকি সব বাজারে বিক্রি করে দিয়ে আসে। এভাবে তার দিন যেতে লাগল, এবং একদিন বড় ভাই থেকে ধনী হয়ে উঠল।

দিনে দিনে বড় ভাই ছোট ভাইয়ের ধনী হওয়া দেখে জ্বলতে লাগল, বুড়ো ভাই ভাবলো কিছুদিন আগে যে ভাই না খেয়ে মরে যাচ্ছিল সে ভাই আবার আজকে আমার থেকেও ধনী? একদিন রাতে বুড়ো ভাই চুপি চুপি ছোট ভাইয়ের ঘরে ঢুকে আসল সত্য জেনে নেয়। পরের দিন যখন ছোট ভাই বাজারে চাল, ডাল বিক্রি করতে গেলো তখন বড় ভাই ছোট ভাইয়ের ঘরে ঢুকে চক্কি চুরি করে নিয়ে এল। এবং ঘরে এসে বড় ভাই তার পরিবার নিয়ে এবং চক্কি নিয়ে দূরে বাসস্থান করবে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সমুদ্রের তীরে গিয়ে একটি নৌকা নিয়ে যাত্রা শুরু করল। বড় ভাইয়ের বউ স্বামীর ব্যবহারে বিস্মিত হয় এবং একসময় এই সামান্য চক্কির জন্য এত কষ্টের কারণ জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু বুড়ো ভাই তার স্ত্রীর প্রশ্নের কোনো জবাব না দেওয়ায় তীর কঠোক্তি করে বলে, "এই সামান্য একটি চক্কির জন্য তুমি আমাদের সবাইকে নিয়ে ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছ; এমন কি এই চক্কিতে?" তখন সে তার স্ত্রীকে শান্ত করার জন্য বলে উঠল এই চক্কি তোকে নমক দিবে। তখন বড় ভাইটি লক্ষ্য করেনি যে তার ছোট ছেলেটি চক্কিটি ঘোরাচ্ছে লাল কাপড় সরিয়ে। এবং তখন ধীরে ধীরে লবণ ঢের লাগতে শুরু হল আর তখনি নৌকা ভারসাম্যতা হারিয়ে ডুবে গেল সমুদ্রের অতলে। তাদের কারোরই চক্কি বন্ধ করার পদ্ধতি না জানায় তারা সবাইর সেখানে জল সমাধি হয়ে গেল, তাই এখনো বলা হয় যে, সমুদ্রের নীচে চক্কি ঘুরছে তাই সমুদ্রের জল লবণাক্ত।





## দেবদেবীর বাহন ও সাথী রূপে জীবজন্তু

প্রসেনজিৎ দেব

টি.ডি.সি. (চতুর্থ সেমিস্টার)

প্রাণী জগতকে কোলে ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে বলে এই পৃথিবী ঈশ্বর সৃষ্ট সব মানুষ ও জীবজন্তুর মাতৃরূপিনী। এই নৈক্যটের কারণে বহুজাগতিক ব্যাপারে মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে জীবজন্তুরা অঙ্গঙ্গভাবে জড়িত। তাই মানুষ সাধারণত জীবজন্তুকে ভালবাসে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল।

পার্থিব জীবজন্তুদের উপেক্ষা না করে আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীগণ এদের অনেককে নিজেদের বাহন, প্রহরী বা সাথী করে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কিছু পরিচিত দৃশ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। দেবাদিদেব মহাদেব ধীরগতি যাঁড়কে বাহন এবং একটি সর্পকে অঙ্গভূষণ করে নিয়েছেন। মহিষাসুরমর্দিনী দেবী-দুর্গার বাহন মহাবল সিংহ এবং প্রহরীরূপে আছে বিষধর সর্প। সৌভাগ্যদায়িনী লক্ষ্মীদেবীর সাথী হিসাবে আছে একটি প্যাঁচা। জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীর বাহন রাজহংস, যে দুধজলের মিশ্রণ থেকে দুধটুকু টেনে নিয়ে দেখিয়ে দেয় কিভাবে নানাবিধ জাগতিক বিষয়বস্তু থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। সিদ্ধিদাতা গণেশের খেলার সাথী একটি ইঁদুর। শৈশবে গণেশ প্রাণরক্ষা পেয়েছিল একটি পশুর জীবনের বিনিময়ে। মাতুল শনি ঠাকুরের কুদৃষ্টিতে শিশু গণেশের মস্তক অদৃশ্য হয়ে গেলে উত্তরদিকে শায়িত একটি হস্তির মস্তক তৎক্ষণাৎ কেটে এনে যথাস্থানে লাগিয়ে তাঁর প্রাণ রক্ষা করা হয়। দেবসেনাপতি পৌরুষ প্রতীক কার্তিক নিজের বাহন হিসাবে নিযুক্ত করেছেন দ্রুতগামী ময়ূর। অন্যদিকে নৃশংস অসুর ছলনার আশ্রয় নিয়ে একটি অবুঝ পশু মহিষের দেহে আত্মগোপন করেছিল কিন্তু প্রাণরক্ষা করতে পারেনি কারণ দুর্গাদেবীর অস্ত্রাঘাতে তাকে বেরিয়ে আসতে হয়। জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর বাহনরূপে নিয়োজিত ভারবাহী হস্তি যার উপর দণ্ডায়মান পশুরাজ সিংহ। মহাশক্তি শ্যামামা বহুরূপে বিরাজিতা-অম্বারূপে তাঁর বাহন হিংস্র ব্যাঘ্র, কামাখ্যা ও মহাকালরূপে বাহন সিংহ, রক্ষাকালী রূপে প্রহরী সিংহ মহাবিদ্যারূপে বাহন রাজহংস এবং “শিশু অসুর” কোলে নলেশ্বরী দেবীরূপে ছত্রাকারে আগলে রেখেছে একটি পঞ্চমুখী সর্প। শ্যামা মায়ের হস্তে ধারণ করা অসুরের ছিন্ন মুণ্ড থেকে ঝরে পড়া রুধির পেছন থেকে নির্ভয়ে ও আনন্দে পান করে যাচ্ছে শেয়ালের দল-এ শ্যামা মায়ের জীবজন্তুকে স্নেহ করার এক অপূর্ব দৃশ্য বটে। অন্যান্য পূজিতা দেবী ‘শীতলা’ বাহন গাধা, ষষ্ঠীদেবীর বাহন বিড়াল এবং মা-মনসার সাথী নাগরাজ। শনিঠাকুরের বাহন শকুন, দেবস্থপতি বিশ্বকর্মার বাহন হিসাবে নিযুক্ত হস্তি। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মার বাহন রাজহংস বা চারটি রাজহংস চালিত রথ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পালক নারায়ণ বা বিষ্ণুর বাহন গরুর পক্ষী, দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত। অগ্নিদেবের বাহন ছাগ বা মেঘ, কখনও চারটি তোতাচালিত রথ। বায়ুদেবতার বাহন হরিণ এবং বরুণদেবের বাহন রাজহংস বা সাতটি রাজহংস চালিত রথ আবার কখনও মকর (মাছ)। সূর্য দেবের রথ চালনা করে একটি, তিনটি বা সাতটি অশ্ব এবং চন্দ্রদেবের রথ ছাগ দ্বারা চালিত। যমরাজের বাহন মহিষ এবং দূত হিসাবে কাজ করে বায়স (কাক)। নবজাত শিশু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কংস’র হাত থেকে প্রাণরক্ষার জন্য পিতা বসুদেব মথুরার জন্মদায়িনী মাতা দেবকীর কোল থেকে গোকুলে পালিকা মাতা যশোদার কাছে দিয়ে আসেন। পথে যমুনা নদী পার হবার সময় প্রবল ঝড়বৃষ্টি থেকে বাসুকী নামক নাগের ছত্ররূপী ফনা শিশুটিকে রক্ষা করেছিল। আবার গোষ্ঠলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সাথী আছে ধেনু। পাশ্চাত্য দেশে গ্রীস ও রোমের বিদ্যা-সংস্কৃতির দেবী যথাক্রমে অ্যাথিনা ও মিনার্তা দু’জনেরই সাথী হিসাবে দেখতে পাওয়া যায় একটি প্যাঁচা। জীবজন্তুর প্রতি দেবতাদের এমন নৈকট্য ও স্নেহ ভালবাসা জীবে প্রেম প্রদর্শনের ইঙ্গিত মানুষের সামনে তুলে ধরে।

সূত্র— ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’





## স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতীয় অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন : সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও তার প্রেক্ষাপট

দেবব্রত দাস

টি.ডি.সি. (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

উনবিংশ শতকে ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্মসর্বক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার, জাতীয়তাবাদ, শিক্ষা প্রগতি সমাজ সংস্কারের ন্যায় প্রগতিশীল ব্যবস্থার সঞ্চার ঘটে। অপর দিকে সমকালীন যুগে এই পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতিই হিন্দু ধর্মের চিরাচরিত ঐতিহ্যসমূহে আঘাত করে। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু সমাজের প্রগতিশীল অংশ ধর্মীয় সংস্কারের দাবিতে অগ্রণী হয়। অপরদিকে নিম্ন বর্ণভুক্ত জাতিসমূহ তাদের প্রাপ্য অধিকারের দাবিতে আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়। অবশ্য ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা এই সকল নিম্নবর্ণীয় মানুষের শ্রেণি চেতনায় উজ্জীবিত করেছিল এমন দাবি করলে সত্যের অপলাপ হবে। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনে প্রবর্তিত ব্যবস্থাসমূহ জাত ব্যবস্থা তার প্রাক্ ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল মাত্র। কিন্তু তাতে জাত ব্যবস্থার অবসান ঘটেনি বরং তা নতুন জীবনীশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে শুরু করে। ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপ না করার নীতির ফলে উপকৃত হয়েছিল সুবিধাভোগী জাতি গোষ্ঠীই। শিক্ষা ও সম্পদের দিক থেকে উঁচু জাতের সদস্য, যাঁরা আগে থেকেই যথেষ্ট প্রাধান্য ভোগ করতো, তাঁরাই ইংরেজি শিক্ষা, নতুন পেশা কিংবা নব প্রবর্তিত আইন ও বিচার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

তাতে অবশ্য জাত ব্যবস্থা বিরোধী, নিম্নবর্ণীয়দের আন্দোলন থেমে থাকেনি। কিন্তু এই আন্দোলনে দুটি ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রগতিশীল ধারা এবং জাতীয়তাবাদ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ধারা। প্রগতিশীল ধারা জাতীয় সংগ্রামে সহায়ক শক্তি হয়ে উঠতে পেরেছিল। একটা নিম্নতর জাত যখন জাতের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়েছিল ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল, তখন সেই সংগ্রাম ভারতীয় জনসাধারণের গণতান্ত্রিক একতার সংগ্রামে সহায়ক হয়ে উঠতে পেরেছিল। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম দুই প্রাণপুরুষ আশ্বদকার ও গান্ধির নেতৃত্বে দলিত ও হরিজনদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা একই সঙ্গে জাতপাত, অস্পৃশ্যতা বিরোধী এবং পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল। অবশ্য আশ্বদকার পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলন অপেক্ষা দলিত অস্পৃশ্যদের নিয়ে গড়ে ওঠা সামাজিক আন্দোলনেই অধিক মনোনিবেশ করেন। গতিশীল ধারা অপেক্ষা বলা চলে এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াশীল তথা জাতীয়তাবাদ বিরোধী ধারাটি অধিক প্রসার লাভ করেছিল। গেইল ওমভেট তাঁর বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে বিংশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে অরাক্ষণদের নেতৃত্বে আন্দোলন এক নতুন মোড় নিয়েছিল এবং তাতে দুটো সমান্তরাল প্রবণতা ছিল লক্ষণীয়। প্রথমত ধনী অরাক্ষণরা নিজেদের উন্নতির আপায় ইংরেজ সরকারের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে এক অনুগত রাজনৈতিক দল গঠন করে। বলা বাহুল্য এই প্রবণতা ছিল রক্ষণশীল দ্বিতীয় প্রবণতা গড়ে উঠেছিল ধাতা 'শোধক সমাজ' এর নেতৃত্বে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এবং ব্যবসায়ী ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থগত বিরোধকে গ্রন্থিবদ্ধ করা ছিল এই সমাজ এর প্রধান উদ্দেশ্য যা আমূল সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচালক। বাংলায় নিচু জাতের সমিতিগুলি গুরুত্ব পেতে থাকে বিংশ শতকের শুরু থেকে। কিছু স্থানীয় জমিদার, কয়েকজন কলকাতাবাসী আইনজীবী ও ব্যবসাদারের নেতৃত্বে মেদিনীপুরের অবস্থাপন্ন কৈবর্তরা নিজেদের মাহিষ্য বলতে শুরু করেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা একটি জাতি নির্ধারণী সভা ও ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে আদম সুমারির সময় কেন্দ্রীয় মাহিষ্য সমিতির পত্তন করেন। পরে মেদিনীপুরের মাহিষ্য জাতপাতের আন্দোলনে লক্ষণীয় ভূমিকা নিয়েছিল। ব্রিটিশদের ভেদ ও শাসননীতি অনেক বেশি সফল হয়েছিল ফরিদপুরের নম শূদ্রদের কাছে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে পর শিক্ষিত লোকদের একটি ছোট শিরোমণি গোষ্ঠীর ও কিছুটা মিশনারিদের উৎসাহে এঁরা সেখানে সমিতি গড়তে শুরু করেন। নমশূদ্ররা ছিলেন অচ্ছাৎ গরিব চাষি। দূরের ব্রিটিশদের চেয়ে উঁচু জাতের বাবুদেরই এরা বড় শত্রু বলে মনে করতেন।



ব্রিটিশ শাসিত ভারতে জাত ব্যবস্থা বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনেছিল। সনাতন ভারতীয় শিক্ষা, সাম্প্রদায়িক চেতনা, জাত প্রথা প্রভৃতি সার্বিক সামাজিক বিষয়সমূহ ব্রিটিশ শাসন তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও প্রগতিশীলতার আলোকে বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। ভারতের সকল সনাতন সামাজিক বিষয়গুলির মধ্যে জাত ব্যবস্থা ছিল অন্যতম একটি। এই জাত ব্যবস্থা সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতে বর্তমান ছিল। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় এই জাতপ্রথার রাতারাতি অবসান তো ঘটেইনি, বরং শুরুতে তার ব্যাপক বৃদ্ধি হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকদের বিবিধ প্রগতিশীল নীতি ও আইন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতাকে আঘাত করে। ফলে হিন্দু রক্ষণশীলরা সার্বিক জাতপাত প্রথাকে পুনরায় নিজেদের সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর চাপিয়ে তাদের সমাজের সংকীর্ণ পরিধিতে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এই প্রবণতা চিরস্থায়ী রূপ পেতে ব্যর্থ হয়। হিন্দু সমাজের প্রান্তিক অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষজন, যারা দীর্ঘদিন ব্যাপী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের জাতপাতের প্রকোপে দীনহীন হয়ে বাঁচতে বাধ্য হতো, তারা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই চিরাচরিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নিম্নবর্ণীয় সম্প্রদায়ের মানুষজনকে নিয়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন জাত সমিতি ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব সর্বক্ষেত্রে তারা সমান অধিকার দাবি করতে শুরু করে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জ্যোতিষকুলে, ই.ডি. রামস্বামী পেরিয়ার, ঠাকুর হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ, ভীমরাও রামোজী আশ্বেদকার প্রমুখের নেতৃত্বে এই সকল আন্দোলন জোরদার হয়। বাংলায় জাত প্রথা বিরোধী আন্দোলন : বাংলায় তিনটি প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতপাত বিরোধী আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়। এই তিনটি সম্প্রদায় হলো— ক) নমশূদ্র সম্প্রদায় ; খ) সাহেবধনী সম্প্রদায় ; গ) বলাহাড়ি সম্প্রদায়।

(ক) নমশূদ্র সম্প্রদায় ও মড়ুয়া ধর্ম আন্দোলন : নমশূদ্র সম্প্রদায়ে জাত প্রথা বিরোধী আন্দোলনের প্রবর্তক তথা প্রাণপুরুষ হলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ও তার পুত্র গুরুচাঁদ বাংলায় সুদীর্ঘকালের অবহেলিত নমশূদ্র সম্প্রদায়কে নিয়ে যে সামাজিক আন্দোলনে নামেন তা 'মতুয়া' আন্দোলন নামে খ্যাত। হরিচাঁদ ঠাকুরের আদর্শে নমশূদ্র সম্প্রদায় এক নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়, তা হলো 'মতুয়া ধর্ম'। নমশূদ্রদের পাশাপাশি মাহিষ্য, কামার, চামার তাঁতি, কপালী প্রভৃতি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষও দলে দলে মতুয়া ধর্মগ্রহণ করেন। মতুয়া ধর্মের মূল মন্ত্র হলো 'হাতে কাম মুখে নাম'। তারা মানুষকে সকলের উর্দে স্থান দেন। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ বন্ধ করা, বিধবা বিবাহ প্রচলন, জাতিভেদ বর্জন, সৎ জীবনযাপন প্রভৃতি হলো মতুয়া ধর্মের সামাজিক কর্মসূচি। জাতপ্রথা বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিলেও মতুয়ারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেয়নি। জাতপাত ও সামাজিক কুপ্রথা বিরোধী সংস্কারমূলক কার্যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেও স্বদেশি আন্দোলনের গর্বে গুরুচাঁদ জাতীয় নেতৃত্বের সাথে সহমত পোষণ করেননি। কারণ তাঁর মতে এই আন্দোলন ছিল ধনী ও শিক্ষিত জমিদারদের স্বার্থে পরিচালিত আন্দোলন, যা নমশূদ্রের স্বার্থের পরিপন্থী।

খ) সাহেবধনী সম্প্রদায় : এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব নদীয়া জেলায়। সাহেবধনীরা মূলত গোণ বা গোয়ালান সম্প্রদায়ভুক্ত, মুলীচাঁদ পাল ও তাঁর পুত্র চরণ পালের নেতৃত্বে সাহেবধনী সম্প্রদায় এক অগ্রগণ্য নিম্নবর্ণীয় সম্প্রদায় রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে সমর্থ হয়। এরা বেদ ও মূর্তিপূজার বিরোধী ছিল।

গ) বলাহাড়ি সম্প্রদায় : বলরাম হাড়ি হলেন এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাই এদের নাম বলরামী বা বলাহাড়ি সম্প্রদায় বলরাম হাড়ি এই সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে দেবতা রূপে পূজিত হন। নমশূদ্র, মুচি, মাহিষ্য শ্রেণির মানুষজন বলরাম হাড়ির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। তারা প্রচলিত দেবদেবীর পূজা, অবতার তত্ত্বে বিশ্বাস না রাখলেও পুনর্জন্মে বিশ্বাস রাখতো।

ঘ) অন্যান্য সম্প্রদায় : উপরোক্ত তিনটি সম্প্রদায় ব্যতীত আরও বিভিন্ন সম্প্রদায় এ সময়ে জাতপাতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। আউলচাঁদ হলো এমনই এক সম্প্রদায়, যারা মিলিত ভজনকীর্তন এবং সতীমার আরাধনা করতো। এ ছাড়াও ছিল মেদিনীপুরের কৈবর্ত সম্প্রদায় যারা পরে নিজেদের মাহিষ্য বলে দাবী করে।

ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সাফল্যের পথে অন্যতম অন্তরায় রূপে চিহ্নিত করা হয় তৎকালীন যুগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা জাগিয়ে জাতীয়তাবাদী ঐক্যকে নষ্ট করতে এ সময়ে কয়েকটি সংগঠন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। তার দুইটি মুখ্য উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার চরমপন্থীর লড়াই।

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা : ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ব্রিটিশ সরকার শিক্ষিত হিন্দু বাবু শ্রেণির পরিবর্তে অশিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়কে সুযোগ সুবিধা দিতে উদ্যোগী হয়। ব্রিটিশদের এই মুসলিম তোষণের কাজকে সফল করতে সৈয়দ আহমেদের মতো কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, মুসলিম রাজকর্মচারী অগ্রণী ভূমিকা নেন। তারা ব্রিটিশ শাসনকে দেবতার আশীর্বাদ রূপে প্রচার করতে থাকে। পাশাপাশি তারা মুসলিমদের একটি স্বতন্ত্র, পৃথক জাতিরূপে প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসকে তারা হিন্দু আধিপত্যবাদী দল রূপে বর্ণনা করে। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে শুরু হওয়া মুসলিম স্বতন্ত্রতার এই জিগির পরিপূর্ণতা পায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নবাব সালিমুল্লাহ, আগা খান প্রমুখের নেতৃত্বে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী চার দশকে এই দল ভারতে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বীজকে মহীরুহ করে তোলায় বিশ্বয়কর সাফল্য লাভ করে। বিশেষ দশকে লিগের হাল ধরেন মহম্মদ আলি জিন্না। জিন্নার নেতৃত্বে লিগ ভারতীয় মুসলমানদের এক বৃহদাংশের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন



হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলে। ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতা এবং কটর কংগ্রেস বিরোধিতা, এই ছিল লিগের কর্মসূচি, চল্লিশের দশকের শুরুতে এক নতুন দাবি লিগের স্লোগান রূপে গৃহীত হয়, তা হলো— 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।' এইরূপ মনোবৃত্তির জন্য এক বৃহত্তর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূত্রপাত হয় যার জন্য এক বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সৃষ্টি হয় সারা ভারত জুড়ে। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কুপ্রভাবেই ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিম লিগ গড়ে ওঠার প্রায় সমসাময়িক কাল থেকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাও নতুন করে উজ্জীবিত হতে শুরু করে। ব্রিটিশ সরকারের 'বিভাজন ও শাসন নীতি'— এর অন্যতম উপাদান ছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা। ঊনবিংশ শতকে একদিকে সৈয়দ আহমেদ খান যেমন ছিলেন ব্রিটিশ অনুগত এবং মুসলিম স্বতন্ত্রতার প্রাণপুরুষ, প্রায় একই সময়ে বারাণসীর রাজা শিব প্রসাদ দত্ত ব্রিটিশের আনুগত্য ও জাতীয়তাবাদ বিরোধী হিসাবে হিন্দু সমাজে পরিচিত পেয়েছিলেন। যে যুগে দয়ানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে আৰ্য সমাজ আন্দোলন হিন্দুত্ববাদী চিন্তা চেতনাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। বিংশ শতকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে জন্ম নেয় দুটি বিখ্যাত সংগঠন 'হিন্দু মহাসভা' এবং 'রাষ্ট্রীয় সংসেবক সংঘ'।

হিন্দু মহাসভা ছিল তৎকালীন সময়ে কংগ্রেস ও কংগ্রেস বহির্ভূত কটর হিন্দুত্ববাদীদের সংগঠন। মদনমোহন মালব্য, লাল্লা লাজপত রায় প্রমুখের নেতৃত্বে 'হিন্দু মহাসভা' গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিনায়ক দামোদর সাভারকর এই সংগঠনকে ভারতীয় হিন্দুদের স্বার্থরক্ষাকারী একটি সংগঠন হিসাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। অপর দিকে বিংশ শতকের বিশেষ দশকের মাঝামাঝি মহারাষ্ট্রের এক সমাজসেবী ডাক্তার ও প্রাক্তন বিপ্লবী কেশব হেজওয়ার স্থাপন করেন 'রাষ্ট্রীয় সংসেবক সংঘ', তিরিশের দশকের শেষে এই সংগঠনের নেতৃত্বভার বর্তায়, গুরু গুলোওয়ালিকরের উপর। গোলওয়ালিকরের নেতৃত্বে আর. এস. এস পরবর্তীকালে ভারতের সর্ববৃহৎ হিন্দুত্ববাদী দল হিসাবে গড়ে ওঠে।

হিন্দু মহাসভা, আর.এস.এস.-এর ন্যায় সংগঠনগুলি ঘোষণা করে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবন ব্যতীত ভারতীয় হিন্দুদের উন্নতি সম্ভব নয়। তারা ঘোষণা করে, হিন্দু ভারতে হিন্দুদের অস্তিত্বই বিপন্ন। এই প্রসঙ্গে সাভারকরের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে— 'We Hindus are reduced to be veritable helots throughout our land. In some cases as in Bengal and the frontier our very life and property hand in hourly anger, the honour of womanhood insecure'.

উপসংহার : একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসেও আমরা দেখতে পাই এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির কুপ্রভাব যা আজকালকার সমাজ জীবনের এক অভিশপ্ত আয়না হিসাবে পরিচিত। সামাজিক দাঙা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত ভেদাভেদ বর্তমানে রাজনীতিক স্বার্থের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিচালিত। পুরাতন ইতিহাস পড়লে আমরা দেখতে পাই যে বহু সমাজ জীবন এই সাম্প্রদায়িক হানাহানির জন্য বিপর্যস্ত। বহু সমাজজীবন জাতিগত বৈষম্যের জন্য ধ্বংসের পথে পরিগণিত হয়েছিল যার কুপ্রভাব আজও আমরা দেখতে পাই। কিছু কিছু ইতিহাসবিদরা মনে করেন এই সাম্প্রদায়িক বিভাজন ভারত বিচ্ছেদের এক মুখ্য কারণ।

তথ্যসূত্র—

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা— Published by Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd, licensees of Pearson Education in South Asia. Copyright (C) 2012 Dorling Kindersby (India) Pvt.Ltd.





## একটু হাসো

প্রসেনজিৎ দেব.

টি.ডি.সি. (চতুর্থ সেমিস্টার)

- ১) শিক্ষক : তোমরা কি জানো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা পনেরো বছরের ছেলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে?  
ছাত্র : কিন্তু স্যার, আমাদের দেশে তো একটা তিন বছরের ছেলে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।
- ২) ট্রেনের কথা : একটা ট্রেনের কামরায় লেখা ছিল, এটি সরকারি সম্পত্তি, এটিকে নিজের সম্পত্তি বলেই মনে করবেন।  
চোরের কথা : একটা চোর ঐ ট্রেনের কামরায় উঠে কামরা থেকে পাখা ও লাইট খুলে নিয়ে লেখাটির পাশে লিখে দিল— নিজের ভাগের সম্পত্তি নিয়ে চলে যাচ্ছি।
- ৩) শিক্ষিকা : রামু তোমার ভাই আজকাল কি কথা বলতে শিখেছে?  
রামু : কথা বলার কী দরকার? ও তো খুব জোরে চোঁচালেই সবকিছু পেয়ে যায়।
- ৪) শিক্ষক : বলো দেখি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে না সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে?  
ছাত্র : আজে তা তো বলতে পারব না, কিন্তু আপনার দিকে তাকালে আমার মাথা ঘুরে।
- ৫) শিক্ষক : তুমি রোজ ক্লাসের মধ্যে এসে যা ইচ্ছে তাই কর, ক্লাসটাতো ইচ্ছা পূরণের জায়গা নয়, আর তাই আমার এ মুহূর্তে তোমাকে পেটাতে ইচ্ছে করছে?  
ছাত্র : ক্লাসটাতো ইচ্ছা পূরণের জায়গা নয় স্যার, আপনিই তো বললেন।





## কিছু জানার কথা

সুপর্ণা সূত্রধর

উচ্চতর মাধ্যমিক (প্রথম বর্ষ)

- ১। হকির জাদুকের কাকে বলা হয়?  
উঃ- ধ্যানচাঁদকে।
- ২। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের আত্মজীবনীর নাম কি?  
উঃ- উইংস অফ ফায়ার।
- ৩। প্রথম কোন সালে কোন জাপানবাসী নোবেল পুরস্কার লাভ করেন? তাঁর নাম কী? কোন বিষয়ে?  
উঃ- ১৯৪৯ সালে প্রথম জাপানবাসী হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন বিজ্ঞানী হেইডিকি ইওকাওয়া। পদার্থ বিজ্ঞানে।
- ৪। ভারতের জাতীয় জলজ প্রাণীর নাম কী?  
উঃ- গাঙ্গেয় ডলফিন বা গ্যাঞ্জোটিক ডলফিন।
- ৫। সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সর্বপ্রথম ভারততত্ত্ব সম্মান লাভ করেছেন?  
উঃ- সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী মাদুরাই শানমুগাভাড়িভু শুভলক্ষ্মী সর্বপ্রথম ভারততত্ত্ব সম্মান লাভ করেন।
- ৬। ডিসেম্বর ১লা তারিখ ও ৩য় তারিখ আন্তর্জাতিক কি কি দিবস রূপে পালন করা হয়?  
উঃ- ডিসেম্বর ১লা তারিখ বিশ্ব এইডস দিবস এবং তিন তারিখ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস হিসেবে পালন করা হয়।
- ৭। ভারতের সর্বপ্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কে? কত সাল থেকে কতসাল পর্যন্ত তিনি কোথায় এই দায়িত্ব পালন করেছেন?  
উঃ- ভারতের সর্বপ্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হলেন সুচেতা কৃপালিনী। ১৯৬৩ সালের ২রা অক্টোবর থেকে ১৯৬৭ সালের ১৪ মে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
- ৮। তিনমূর্তি হাউস কি? এবং সেটি কোথায় অবস্থিত?  
উঃ- দিল্লির তিনমূর্তি হাউস ছিল ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর অফিসিয়াল বাসস্থান। ১৯৬৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তিনমূর্তি হাউসকে 'নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম' এ পরিবর্তিত করা হয়েছে।
- ৯। বাংলার টপ্পা জাতীয় গান রচনার জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম কী? তাঁর রচিত টপ্পা কী নামে পরিচিত?  
উঃ- নিধিরাম গুপ্ত বা রামনিধি গুপ্ত। ১৭৪১ সালে জন্মগ্রহণ এই নিধিরাম গুপ্ত 'নিধুবাবু' নামেই বিশেষ পরিচিত। তাঁর রচিত টপ্পা 'নিধুবাবুর টপ্পা' নামে প্রসিদ্ধ।
- ১০। থাইল্যান্ডের স্থানীয় ভাষায় 'অটো' নামের যানটিকে কী বলে?  
উঃ- টুকটুক বলা হয়।
- ১১। 'ছোটো পেলো' বা ওই খেলোয়াড়ের দেশের ভাষায় 'পেলুসা' কাকে বলা হয়?  
উঃ- দিয়াগো মারাদোনাকে 'ছোটো পেলো' বা ওদের দেশের ভাষায় 'পেলুসা' বলা হয়।
- ১২। সেলুলার জেল কোথায় অবস্থিত? এটি জাতীয় স্মারক হিসেবে কবে ঘোষণা করা হয়?  
উঃ- সেলুলার জেল আন্দামানে অবস্থিত। পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্রিটিশ শাসকরা কুখ্যাত অপরাধীদের ওই জেলে কারাবন্দি করে রাখত। ১৯৭৯ সালে জাতীয় দাবিতে তখনকার প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই সেলুলার জেলকে জাতীয় স্মারক হিসেবে ঘোষণা করেন।
- ১৩। 'শাত-ইল-আরব' কী?  
উঃ- ২,৮০০ দীর্ঘ দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার দীর্ঘতম নদী ইউফ্রেটিস এর প্রাচীন নাম 'ফোরতে'। তাই প্রিস নদীর সঙ্গে মিলিত হবার পর এর নাম হয় শাত ইল আরব।
- ১৪। 'সুরাস্ট্র' কোথায় অবস্থিত? বর্তমানে এটির নাম কী?  
উঃ- গুজরাটের অন্তর্গত কাথিয়াবাড় নামক উপদ্বীপের প্রাচীন নাম ছিল সুরাস্ট্র।







## কিছু জানা কিছু অজানা

সুদীপা দেব

টি.ডি.সি. (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

- ১। ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক বলা হয় কাকে?  
— দাদা সাহেব ফালকে কে বলা হয়।
- ২। প্রথম দূরবীন কে কবে আবিষ্কার করেন?  
— ১৬০৯ সালে গ্যালিলিও।
- ৩। কোন প্রাণী মায়ের গর্ভে ৬৪৫ দিন থাকে?  
— হাতির বাচ্চা।
- ৩। প্রোটিন কে কবে আবিষ্কার করেন?  
— ১৮৮৬ সালে গোল্ডস্টেইন।
- ৫। কোন পাখির ডিম সবচেয়ে বৃহৎ?  
— অস্ট্রিচ পাখি।
- ৬। প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারীর নাম কী?  
— রাকেশ শর্মা।
- ৭। কোন গাছের ছাল দিয়ে কুইনাইন হয়?  
— সিন্ধোনা গাছের ছাল দিয়ে।
- ৮। স্টেথোস্কোপ কে আবিষ্কার করেছিলেন?  
— ডঃ থিয়োফিল লিনেক।
- ৯। কালাজ্বরের ওষুধ কে আবিষ্কার করেছিলেন?  
— উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।
- ১০। ৭৫ বছর পর পর কোন ধূমকেতু দেখা যায়?  
— হ্যালির ধূমকেতু।
- ১১। বিশ্বের কোন দেশ নারী বর্জিত?  
— গ্রীস দেশের দ্বীপ কেরিস এথোস।
- ১২। গ্রীক পুরানে কোন দেবতার শতচক্ষু ছিল?  
— আর্গাস।
- ১৩। প্রথম ভারতীয় মহিলা ইঞ্জিনিয়ার কে ছিলেন?  
— ইলা মঞ্জুমদার।
- ১৪। বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে ঝড় বৃষ্টি হয়?  
— ট্রোপোস্ফিয়ার।
- ১৫। ক্রিমে শতকরা কত ভাগ চর্বি থাকে?  
— ৪০ ভাগ চর্বি থাকে।





## গুজব খবর

পরিমিতা সাহা

টি.ডি.সি. (ষষ্ঠসেমিস্টার)

খবর পড়ছি কয়েকটি মাসের, গত দুর্গাপূজার সময় আমি উধারবন্দে পুজো দেখতে গেছিলাম, হঠাৎ যেখানে কঙ্কালের নাচ দেখানো হয়েছিল সেখানে দুটো ভাই ও বোন কঙ্কাল দুটির সামনে বসে হাউ মাউ করে কাঁদছিল। ভিড়ের মধ্যে অনেক কষ্টে তাদের সামনে যাই এবং কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করায় ভাই ও বোন জানালো যে কয়েকদিন আগেই নাকি তাদের বাবা ও মা মারা গেছেন এবং তাদের তুলে এনেই নাকি এই নাচ দেখানো হচ্ছে। সেই কথা নিয়ে সেখানে এক বিরাট গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। তারপর সেখানকার স্থানীয় পুলিশ ও জনসাধারণ তাদের বুঝিয়ে বলেছেন যে এই কঙ্কাল দুটি কারও বাবা মা নন প্রাস্তিক দিয়ে মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যে বানানো হয়েছে এই দুটি কঙ্কাল।

গত ১৯ ডিসেম্বর আমি বিহারা অঞ্চলের বাবু পাড়া নামে একটি গ্রামে বেড়াতে যাই। সে দিনটি ছিল মেঘলা। সেদিন বিকেল ৪টা নাগাদ একটা দমকা হাওয়া এসে আমার চোখের সামনে ১ ফুট লম্বা বিরাট একটি তুলসী গাছ উপরে পড়ে প্রায় তিনশত পিঁপড়ে ও দুটি ব্যাঙ চাপা পড়ে ফলে ব্যাঙ দুজন ভীষণভাবে আহত হয়েছে এবং ১৮৩ জন পিঁপড়ে নিহত হয়েছে বাকিদের মধ্যে কয়েকজন শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি আছে। এই দুর্ঘটনার জন্য সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা ভীষণভাবে মর্মান্বিত।

এরপর গত ২৬ জানুয়ারি আমার পাশের বাড়ির মিস্তি-বৌদি তার রান্নাঘরে তারই একটি ৭ বছরের অপরটি ও বছরের বাচ্চাকে টিফিন খেতে দিয়ে সে অন্য ঘরে জল আনতে যায়। ঘরের দরজা ভেজানো ছিলো, সেই ফাঁকে দুটো আরশোলা রান্না ঘরে ঢুকে বাচ্চা দুটোকে ভীষণভাবে আক্রমণ করলো। মাগো, বাবাগো বলেও তারা রেহাই পেল না। আরশোলা দুটো উড়ে গিয়ে কখনো তাদের খাবারে আবার কখনো চোখে মুখে আঁচড় দিতে লাগলো। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা দৌড়ে এসে লাঠি, তরোয়াল, শাবল, দা ইত্যাদি ব্যবহার করেও তাদের তাড়াতে পারলো না, শেষে এক গামলা গরম জলই ওদের উপযুক্ত ওষুধ বলে মনে হল। আরশোলাটা গরম জলেই ইহলোক ছেড়ে পরলোক গমন করলো। এরপর গত ৩রা ফেব্রুয়ারি আমি রংপুর একটি বিয়েবাড়ি যাবার সময় যখন সদরঘাট ব্রিজ পার হচ্ছিলাম তখন আমার চোখের সামনে দুটি বিড়াল গল্প করতে করতে হঠাৎ একটি বিড়াল আত্মহত্যা করার জন্য জলে ঝাপ দেয় কিন্তু ব্রিজের নিচে নৌকা থাকায় বিড়ালটি আর আত্মহত্যা করতে পারলো না। বিড়াল দুটি সম্পর্কে ছিল স্বামী স্ত্রী।

গত ২০ ফেব্রুয়ারি রাধামাধব কলেজের ঠিক বিপরীতে একটি বাড়িতে রাত্রিবেলা কয়েকজন ডাকাত ঢুকে ভদ্রলোকের চালের বস্তার নিচের অংশ কেটে প্রায় ৩০০ গ্রাম চাল নিয়ে পালিয়ে যাবে ঠিক করে সেই সময় কুটুর কাটুর শব্দ শুনে ভদ্রলোকের ৭০ বছরের বুড়ো মা চিৎকার করে এবং সবাইকে ডেকে আনে। এমন কি পুলিশকেও খবর দেয়। বিরাট কাণ্ড রাত প্রায় দুটো বাজে তখন ভদ্রলোকের বাড়িতে ডাকাত ধরো, মারো, মারো এই শব্দে কহাজার লোক জমা হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত পুলিশের লোক ও ভদ্রলোকের ৬ বছরের নাতি পিকলু সেই ডাকাত ধরলো। ডাকাত আর কেউ নয় ছোট ছোট কয়েকটি ইঁদুর। আমার গুজব খবর এই পর্যন্ত—





# ভারতীয় 'লোকসংস্কৃতি' চর্চার ঐতিহাসিক রূপরেখা

## 'লোকসংস্কৃতির' অবস্থান

দিলু দাস

টি.ডি.সি. (চতুর্থ সেমিস্টার)

যুগবিভাগ নির্ভর ইতিহাস অনুশীলন যে কোনো বিদ্যাচর্চার অনিবার্য অঙ্গ। সে কোনো শাস্ত্র বা বিষয়ের সম্যক অনুশীলনের ক্ষেত্রে দেশ কালনির্ভর ঐতিহাসিক পটভূমির পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট। বিষয়ের আনুপূর্বিক চর্চার ইতিহাস অনুশীলন একান্ত কর্তব্য। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে যুগবিভাজন ও যুগলক্ষণ নিধারণ অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়। যুগবিভাজন ও যুগলক্ষণ অনুসারে ইতিহাস পরিক্রমার মাধ্যমেই বিশিষ্ট বিদ্যার অগ্রগতির রূপ ও বিষয়বস্তুগত গুরুত্বের স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সেই সূত্রে প্রতীয়মান হয় সংশ্লিষ্ট বিদ্যাচর্চার গতি প্রকৃতি। আধুনিক জ্ঞানরাজ্যের বিশিষ্ট শাস্ত্র হিসাবে বিকশিত লোকসংস্কৃতি বিদ্যার সম্যক পরিচয় পাঠের প্রারম্ভে তাই বিশেষভাবে বিশ্ব তথা ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস বা ঐতিহাসিক রূপরেখা অনুশীলন একান্ত অপরিহার্য। লোকসংস্কৃতি একটি প্রধান বিদ্যায়তনিক অন্তর্বিদ্যামূলক বিষয় হিসাবে সুপরিচিত। আধুনিককালে লোকসংস্কৃতি যে কোনো দেশের জাতীয় সত্তা আবিষ্কারের অন্যতম প্রধান অবলম্বন হিসাবে বিবেচিত হয়। সামাজিক সাংস্কৃতিক ধারায় বিদ্যায়তনিক লোকসংস্কৃতি শাস্ত্রের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে লোকসংস্কৃতির চর্চার ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতি অনুশীলন একান্ত অপরিহার্য।

জীবন ধারণ ও জীবনযাপন পদ্ধতির লৌকিক ধারা থেকেই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। সংহত সমাজ জীবন প্রয়াসের বৃত্তে সমষ্টিগত আবেগও অনুভূতির প্রেরণাতেই লোকসংস্কৃতি বিকশিত হয়। লোকসংস্কৃতির মধ্যে ব্যক্তিপ্রতিভা সমষ্টিতে অবলুপ্ত হয়। লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের পটভূমিতে থাকে সমষ্টিগত প্রয়াস ও সমষ্টিগত উচ্চারণের সাধারণ স্বীকৃতি। মূলত, ঐতিহ্যানুসারী ধারায় লোকসমাজ জীবনকে অবলম্বন করেই লোকসংস্কৃতি বিকশিত হয় বহু বিচিত্র ধারায়। ঐতিহ্যানুসরণই লোকসংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য এবং প্রথাবদ্ধ রক্ষণশীলতার ভিত্তিতেই মূল লোকসংস্কৃতির বিকাশ।

আধুনিক বিশ্বে জ্ঞানরাজ্যের ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি একটি অন্যতম প্রধান বিদ্যা হিসাবে স্বীকৃত। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে "ফোকলোর" বা "লোককৃতি" তথা লোকসংস্কৃতি শব্দটির উদ্ভব হলেও বিশিষ্ট অর্থে লোকসংস্কৃতিচর্চার সূত্রপাত ঘটেছে সম্ভবত ষোড়শ শতকে জার্মানিতে। কালক্রমে জার্মানি, ইংল্যান্ড, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, রাশিয়া, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিভিন্নভাবে লোকসংস্কৃতি চর্চা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের ধারা প্রবাহমান। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভারতবর্ষে লোকসংস্কৃতি চর্চা হয়েছে সুদূর অতীত কাল থেকে। ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিদর্শন হিসাবে পুরাণকাহিনি জাতক কাহিনি, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বৃহৎকথা, কথাসরিৎ সাগর, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক অর্থে ভারতবর্ষে লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রত্যক্ষ ইতিহাস ইংরেজ আগমনের পর সংঘটিত হয়েছে বলেই ধরা হয়। লোকসংস্কৃতিচর্চার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ আবহমানকাল লোকজীবনকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হলেও লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের সচেতন উদ্দেশ্যমুখীন প্রচেষ্টা আধুনিককালের ঘটনা। ভারতবর্ষে লোকসংস্কৃতি চর্চার সচেতন ঐতিহাসিক প্রয়াসের পটভূমিতেই লোকসংস্কৃতি শাস্ত্রের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত অন্বেষণ সার্থকতা লাভ করতে পারে।

ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক অর্থে লোকসংস্কৃতি চর্চার সচেতন সূত্রপাত ঘটে প্রধানত পাশ্চাত্য মনীষীদের দ্বারা। ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার আধুনিক ধারাকে ইতিহাসের পটভূমিকায় সঞ্চালন যুগবিভাগের মাধ্যমে অনুশীলন করা প্রয়োজন। যুগবিভাজনের মাধ্যমে একদিকে যেমন ইতিহাসের উত্থান পতনের ধারা লক্ষ্য করা যায়, তেমনি লোকসংস্কৃতি চর্চার গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবর্তনের স্তরানুসারে সর্বভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসকে প্রধান পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়—



পর্ব	কালসীমা	অনুদ্বন্দ্ব	পর্বনাম
প্রথম	১৭৭২ খ্রিঃ-১৭৮৩ খ্রিঃ	ওয়ারেন হেস্টিংসের পর ১৭৭২	ব্যক্তিগত প্রয়াসের পর্ব
দ্বিতীয়	১৭৮৪ খ্রিঃ-১৮৮৪ খ্রিঃ	এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ১৭৮৪ খ্রিঃ	বিদেশি প্রচেষ্টা জাত সংগঠনের পর্ব
তৃতীয়	১৮৮৪ খ্রিঃ-১৯৪৬ খ্রিঃ	ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫ খ্রিঃ	স্বদেশানুরাগমূলক জাতীয় আন্দোলনের পর্ব
চতুর্থ	১৯৪৭ খ্রিঃ-১৯৮৯ খ্রিঃ	ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ১৯৪৭ খ্রিঃ	জাতীয়তাবাদী বিদ্যায়তনিক পর্ব
পঞ্চম	১৯৯০ খ্রিঃ পরবর্তী	স্বতন্ত্র লোকসংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠা ১৯৯০ খ্রিঃ	স্বকীয় শিক্ষাগত শৃঙ্খলা পর্ব

বৃহৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতবর্ষের লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন বহুবিধ বৈচিত্র্যের অবস্থান দেখা যায় তেমন দেখা যায় বিভিন্ন প্রদেশ ও ভাষার লোকসংস্কৃতি চর্চার আপেক্ষিক ঐতিহাসিক ধারা। তত্ত্বি আভাসিকভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের স্বতন্ত্র বা স্বকীয় যুগবিভাজন ও যুগবৈশিষ্ট্য নিরূপণ সম্ভব ও স্বাভাবিক। তদুপায় সমগ্র ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে লোকসংস্কৃতি চর্চার সামগ্রিক ইতিহাস অনুশীলনের প্রয়োজনে একটি বৃহত্তর সর্বভারতীয় যুগ বিভাগ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের উপর ভিত্তি রেখে পঞ্চপর্ববিভক্ত করা যায় তার বিস্তৃত আলোচনা। ভারতীয় লোকসংস্কৃতির যুগপর্ব সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞাত হওয়া যায়।

ক) ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের প্রথম পর্বটিকে ব্যক্তিগত প্রয়াসের পর্ব হিসাবে অভিহিত করা যায়। ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার সচেতন ধারা ইংরেজ আগমনের পরেই প্রসার লাভ করে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ মিশনারীগণের আগমন ঘটে এই বিদেশি মিশনারীগণ ও বিদেশি পণ্ডিতদের ব্যক্তিগত কৌতূহল বা প্রবণতা অনুসারে অনেকে এদেশের জনজীবনের রীতিনীতি, বিশ্বাস প্রথা, ধর্ম, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে নানারূপ তথ্যাদি সংগ্রহ, প্রকাশ ও আলোচনাদি করেন। এইভাবে দেশের লোকসংস্কৃতি চর্চায় বিদেশি আগন্তুকগণের সক্রিয়তা দেখা যায়।

১৭৭২ খ্রিঃ ওয়ারেন হেস্টিংস কোলকাতাকে একটি পত্র লেখেন যার মধ্যে দেশজ শিক্ষাকলা ও প্রথা নিঃসংশয় বিশেষ নির্দেশ লিপিবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রটিকে ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে সচেতন সূচনা হিসাবে গণ্য করা যায়। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী কালসীমায় ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চা মুখ্যত বিদেশিগণের বিক্ষিপ্ত ও ব্যক্তিগত প্রয়াসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই দিক থেকে আধুনিক লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রথম পর্বটিকে ব্যক্তিগত প্রয়াসের নামে অভিহিত করা যায়।

খ) ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে দ্বিতীয় পর্বটির সূত্রপাত ঘটে ১৭৮৪ খ্রিঃ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও কার্যধারার মধ্য দিয়ে ভারততত্ত্ব ও প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ধারা প্রসারিত হয়।

মুখ্যত বিদেশি প্রশাসক ও মনীষীগণের প্রচেষ্টায় এই পর্বে লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস সুসংহত রূপলাভ করে। তাই ১৭৮৪ খ্রিঃ থেকে ১৮৮৪ খ্রিঃ কাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত লোকসংস্কৃতি চর্চার একশত বৎসরের ইতিহাস মুখ্যত বিদেশি প্রচেষ্টাজাত সংহতির পর্ব।

গ) ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের তৃতীয় পর্বের কালসীমা ১৮৮৫-১৯৪৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। বিদেশি প্রচেষ্টাজাত ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ভারতবর্ষে বিদেশি ইংরেজদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নানা প্রকার বিক্ষোভ ও আন্দোলন বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এইসব আন্দোলন ক্রমশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

এইভাবে ১৮৮৫ খ্রিঃ থেকে ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে সৃষ্টি হয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পর্ব। স্বাধীনতালাভের ও জাতীয়তাবোধের চেতনাসঞ্চার ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার এই তৃতীয় পর্বকে (১৮৮৪-১৯৪৬ খ্রিঃ) স্বদেশানুরাগমূলক জাতীয় আন্দোলনের পর্ব হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

ঘ) ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে চতুর্থ পর্বের কালসীমা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিদেশি শাসনের অবসান ও স্বাধীনতা অবসান ও স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমেই লোকসংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত হয় নতুন পর্ব। প্রাক স্বাধীনতা যুগের জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ স্বাধীনতা উত্তরকালের বিশেষরূপে অঙ্কিত হয় শিক্ষানুসারী প্রয়াসে। প্রাথমিক পর্যায়ে লোকসংস্কৃতি চর্চার শিক্ষানুসারী প্রয়াস প্রধানত অন্যবিধ জ্ঞান বিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অনুশীলিত হয়। আন্তর্জাতিক নৃ-বিজ্ঞান ও জাতিতত্ত্ব বিষয়ক কংগ্রেসের অনুদ্বন্দ্ব কলকাতায় লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান সমগ্র ভারতে লোকসংস্কৃতি চর্চায় ব্যাপক উদ্দীপনা সঞ্চার করে।

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে নতুন ধারার সূচনা হয়। স্বাধীনতা উত্তর কালে লোকসংস্কৃতি চর্চায় স্বদেশানুরাগের ভাবাবেগ হ্রাস পায় এবং উদ্ভূত হয় বিদ্যায়তনিক ধারায় এই প্রচেষ্টা। স্বাধীনতা পরবর্তী লোকসংস্কৃতির শিক্ষাগত বিদ্যায়তনিক ধারা এই পর্বে মূলত তিনটি স্তর অবলম্বন করে—

১। জ্ঞান বিদ্যানুসারী বিচ্ছিন্ন ধারা



২। জ্ঞতিবিদ্যানুসারী বিশেষ ধারা

৩। শিক্ষাগত শৃঙ্খলনির্ভর স্বকীয় ধারা

৬) ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার পঞ্চম পর্বের সূচনা হয় ১৯৯০ খ্রিঃ। শিক্ষানুসারী পূর্ববর্তী স্বাধীনতা উত্তর পর্যায়ে লোকসংস্কৃতি চর্চা বহুলাংশে শিক্ষানুসারী হলেও তা ছিল মুখ্যত অন্যবিদ জ্ঞতিবিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। স্বাধীনতা উত্তরকালে লোকসংস্কৃতি চর্চার শিক্ষানুসারী প্রয়াসে পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণভারত, পশ্চিমভারত, উত্তরভারত, উত্তর পূর্বভারত, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলের প্রচেষ্টা বিশেষ স্মরণীয়।

স্বাধীনতা উত্তরকালে সমগ্র ভারতব্যাপী শিক্ষাগত শৃঙ্খলা নির্ভর বিদ্যায়তনিক বহুমুখী প্রয়াসের বিশেষ ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রথম পূর্ণাঙ্গ লোকসংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বলা যায়, পূর্ববর্তী জ্ঞতি বিদ্যাশ্রয়ী, শিক্ষাগত প্রয়াসের পথ ধরে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে সৃষ্টি হয় স্বকীয় শিক্ষাগত শৃঙ্খলার পর্ব।

শিক্ষাগত শৃঙ্খলনির্ভর লোকসংস্কৃতি বিদ্যাচর্চা বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই কমবেশী প্রাধান্য লাভ করেছে। শিক্ষাগত শৃঙ্খলনির্ভর লোকসংস্কৃতি চর্চার অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে খুব স্বাভাবিকভাবেই লোকসংস্কৃতি শাস্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনের বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের পটভূমিকায় দেখা যায় ১৯৯০ খ্রিঃ শুধুমাত্র লোকসংস্কৃতি বিদ্যার স্বতন্ত্র ও স্বকীয় শৃঙ্খলার পর্বকে উদ্ঘাটন করেনি। তা উন্মোচিত করেছে এক নতুন দিগন্ত। কিন্তু তদুপে পদার্থবিদ্যাগত সুদৃঢ় নিষ্ঠাহীন অবৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা লোকসংস্কৃতি চর্চায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করে।

সংস্কৃতির স্তরভেদ ও লোকসংস্কৃতির অবস্থান—

মনুষ্যসমাজের সামগ্রিক সামাজিক ক্রমানুবর্তনই সংস্কৃতিরূপে রূপে অভিহিত হয়। যে কৃতির বলে মানুষ ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যে জীবনপ্রয়াস ও মানসিক সৃষ্টিশক্তির বহুবিধ বৈচিত্র্যে জীবনকে বিকশিত করে তাই সংস্কৃতি।

কালের বিবর্তনে সমাজ যখন বর্ণ বা বৃত্তি বা শ্রেণিগত বিভাগে স্পষ্ট হল, সেই সময় থেকেই সংস্কৃতির বিভক্তি হল বিভিন্ন ধারায়। সংস্কৃতির এই শ্রেণিভেদ শ্রেণিবিভক্ত সমাজেরই অনিবার্য পরিণাম। সমাজ যখন বিভক্ত সংস্কৃতিও তখন বিভক্ত; এবং এই রকম সমাজ পরিবেশেই সংস্কৃতির বিভেদ পরিলক্ষিত হয় এবং লোকজীবন ও উচ্চ জীবনাশ্রয়ী সংস্কৃতির দ্বিবিধরূপ প্রকাশ লাভ করে লোকসংস্কৃতি ও উচ্চসংস্কৃতির মধ্যে।

সমাজ ও সভ্যতার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লোক সংস্কৃতির অবস্থানগত বিশিষ্টরূপ পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। সমাজ ও সভ্যতার ধারাকে বিভিন্ন সৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন রূপে বিশিষ্ট করে পর্যবেক্ষণ করা হয়। মোটের উপর বলা যায় জৈবিক জীবন প্রবাহ উৎপাদন পদ্ধতি ও বস্তুনিষ্ঠতার এর আর্থ সামাজিক ব্যবহার বস্তুগত সৌধ বা ভিত্তিভূমিকে অবলম্বন করে সাংস্কৃতিক উপসৌধের রূপ আত্মপ্রকাশ করে বিচিত্র ধারায়, যার এক বৈশিষ্ট্যময় প্রকাশ—“ফোকলোর” তথা “লোককৃতি” বা “লোকসংস্কৃতি”। মানবসমাজের তলা সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে লোকসংস্কৃতি সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের এক অনিবার্য পরিণাম। সমাজ বিজ্ঞানীগণ বিবর্তনের তত্ত্বানুসারে সমাজ বিকাশের এক প্রান্তে আদিম সমাজের রূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং অন্য প্রান্তে প্রত্যক্ষ করেছেন অগ্রবর্তী সমাজের রূপ ও প্রকৃতি। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের সমাজের রূপ ও প্রকৃতি। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের দিক থেকে, লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় সে সমাজ বিকাশের বিশিষ্ট স্তরানুসারে লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। আর্থ সামাজিক কারণ এবং উৎপাদন বস্তুনিষ্ঠতার তারতম্যে সমাজ বিকাশের ধারায় নানারূপ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়েছে কালের প্রবাহে। আদিম সমাজ ছিল মুখ্যত সূক্ষ্মপদ্ধ সমষ্টিগতরূপ। সমাজ অগ্রগতির ধারায় শ্রেণিবদ্ধগত বিভেদের মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন প্রকারে বিনষ্ট হয়েছে সমাজের ও কয়েকজন্য সমষ্টিগত রূপ। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের তত্ত্বগত দিক থেকে তাই বলা হয় আদিম সমাজের সমষ্টিগত জীবনধারার বিশিষ্টরূপ আদিম সংস্কৃতির অভিন্ন রূপ ধারায় সৃষ্টি করেছে। লোক সংস্কৃতির একক আদিম রূপকে সাধারণ বলা যায়— আদিম সংস্কৃতি (Primitive Culture)। বিপরীতক্রমে সমাজ অগ্রগতির বিশিষ্ট পর্যায়ে সমাজ যখন নানাভাবে বিভক্ত হয়েছে তখন সমাজ ও জীবনধারার বিভিন্নতার ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে সংস্কৃতির বিভিন্নরূপ। অগ্রবর্তী সমাজের সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপের বিশিষ্ট প্রকাশকে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মুখ্যত দ্বৈত ধারায় অবলোকন করা যায়—

ক) উচ্চ বা শিষ্ট সংস্কৃতি (High Culture)

খ) লৌকিক বা লোকসংস্কৃতি (Folklore)

সামগ্রিকভাবে সমাজের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে লোকসংস্কৃতির অবস্থানগত প্রকৃতি অনুধাবনের সূত্রে বলা যায় যে সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপ সমাজ বাস্তবতার প্রভাবে প্রধানত তিনটি ধারায় আত্মপ্রকাশ করে—

ক) আদিম সংস্কৃতি বা Primitive Culture

খ) লোকসংস্কৃতি বা Folklore



গ) উচ্চসংস্কৃতি বা Higher Culture

আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ বিকাশের স্তরভেদ অনুসারে সংস্কৃতির যে রূপভেদ বিশ্লেষণ করা যায়, তারই এক বিশিষ্ট বিভাগ লোকসংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানুষের জীবনধারণারই বিশিষ্ট অভিব্যক্তি। সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় যেমন সামাজিক জীবনধারা ও মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে, তদনুসারে সংস্কৃতিরও ঘটে রূপান্তর। বিভিন্ন শাস্ত্র অনুসারে যেমন সমাজ ও সভ্যতার উদ্ভব বিকাশের ইতিহাসকে বিভিন্ন রূপে বর্ণনা করা হয়, তেমন লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে প্রধানত আদিম সমাজ ও অগ্রবর্তী সমাজ এই দুই স্তরে বিভক্ত করা যায় এবং তদানুসারে সংস্কৃতির রূপভেদ পর্যবেক্ষণ করা যায়। সংস্কৃতির এই রূপভেদ এবং লোকসংস্কৃতির অবস্থানগত প্রকৃতি নিম্নলিখিত রেখাচিত্রে বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়—

স্তর	সমাজ	সমাজের রূপ	সংস্কৃতির রূপ
প্রাথমিক	আদিম সমাজ	গোষ্ঠীবদ্ধ অবিভক্ত সমাজ	অবিভক্ত সংস্কৃতি → আদিম সংস্কৃতি
দ্বিতীয়	অগ্রবর্তী বিভক্ত সমাজ	বিভক্ত সমাজ	বিভক্ত সংস্কৃতি <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>আদিম সংস্কৃতি</span> <span>লোকসংস্কৃতি</span> <span>উচ্চসংস্কৃতি</span> </div>

উপরে বর্ণিত রেখাচিত্রে অনুসারে দেখা যায়। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের প্রাথমিক স্তরে যে আদিম সমাজের অবস্থান, সেখানে সমাজের রূপ গোষ্ঠীবদ্ধ ও অবিভক্ত। সমাজের রূপ যেহেতু গোষ্ঠীবদ্ধ ও অবিভক্ত, তাই সংস্কৃতির রূপও আদিম স্তরে অবিভক্ত বা অভিন্ন আদিম একক সংস্কৃতি হিসাবে গণ্য করা হয়। সমাজ বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রবর্তী সমাজের পটভূমিকায় বর্ণ শ্রেণীগত বিকাশ অনুসারে সমাজ বিভক্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অগ্রবর্তী বিভক্ত সমাজের সংস্কৃতির রূপ খুব স্বাভাবিকভাবে বিভক্ত সংস্কৃতির ধারায় আত্মপ্রকাশ করে। বিভক্ত সংস্কৃতির রূপগুলিকে মূলত তিনটি পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা যায় আদিম সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও উচ্চসংস্কৃতি। এই স্তরভেদের অনুসঙ্গে লোকসংস্কৃতির সমাজ সংস্কৃতিগত বিশিষ্ট অবস্থানের রূপ অনুধাবন করা যায়।

আর্থ সামাজিক ক্ষমতাকেন্দ্র বা সুবিধাভোগী স্তরানুসারে এবং কেন্দ্র দূরবর্তী প্রান্তিক জনজাতি নির্ভর জীবনচর্যার বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশ ঘটা একান্ত স্বাভাবিক। ইতিহাসের ধারায় সংস্কৃতির বহু রৈখিকরূপ বা প্রকৃতি দেখা দিলেও প্রকৃতপক্ষে লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, সংস্কৃতির বিভাজনসমূহ সতত একান্তরূপে স্বতন্ত্র বা অন্যান্যরূপে নয় এবং তা বহুলাংশে আপেক্ষিক। অর্থাৎ উদ্ভব বিকাশের ধারায় সংস্কৃতির প্রবাহে যেমন বিভিন্নতা দেখা দেয়। তেমন অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদানের সম্পর্কে সক্রিয় থাকে। এই প্রকার মিলও দেখা যায়।

উপসংহার

সমগ্র আলোচনার উপরোক্তিতে একথা বলা বাহুল্য যে, জীবন অধিত বাস্তবতার বিশেষ পটভূমিতেই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব, বিকাশ ও অবস্থানগত পরম্পরা প্রবাহিত হয়। ধারাবাহিকতার রূপ ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ লক্ষণ অনুসারেই লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয় আত্মগত নির্মাণ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায়।

সমাজ বিকাশের গতি প্রবাহজাত বৈশিষ্ট্য অনুসারে লোকসংস্কৃতির রূপ ও স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় লোকসংস্কৃতি কোনো আকস্মিক উদ্ভূত বিষয় নয়, তা একান্তভাবে মানব সমাজ ও জীবনধারণার উদ্ভব ও বিকাশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াজাত এক অনিবার্য পরিণাম।

সহায়ক গ্রন্থ—

চট্টোপাধ্যায় তুষার, লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০১, বৈশাখ

১৪০৮।





## ‘বাউলগান : মানবতার গান’

মণিদীপা গোস্বামী

প্রাক্তন ছাত্রী

“আমি কি সন্ধানে যাই সেখানে  
আমার মনের মানুষ যেখানে।।”

বাংলাদেশ চিরকালই গীতিময়। বাংলাসাহিত্যে সূচনালগ্নে সৃষ্ট চর্যাগীতি থেকে শুরু করে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’, ‘অনুবাদ সাহিত্য’, ‘মঙ্গলকাব্য’, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী প্রভৃতি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত রচিত সকল সাহিত্যই ছিলো মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। এই ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের ফলস্বরূপ যুগ চেতনায় হারিয়ে যেতে না যেতেই নতুন উষার ভোরে শোনা গেলো গীতিসাহিত্যের কলকাকলি। মধ্যযুগে রচিত গীতি সাহিত্যের মধ্যে বাঙালির প্রাণের সম্পদরূপে আজও যা বাংলার হাটে, মাঠে, ঘাটে শোনা যায়, তা হলো কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত ও বাউলগান।

“গেয়ে গান নাচে বাউল  
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।”

শাস্ত্রানুসরণের কঠিন পথ পরিহার করে মধ্যযুগে একদল মানুষ বিশ্বাস যাপন করেছিলো সহজ সাধনার প্রকাশভূমিতে— তারাই বাউল। বাউলরা ভাবের পাগল। তাদের প্রেম ‘মনের মানুষের’ প্রতি নিবেদিত। সীমার বন্ধনকে অতিক্রম করে অসীমতায় পৌঁছাই বাউলের সাধনা। ‘বাউল’ শব্দের উৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করলে ভিন্ন মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। কারো মতে, ‘বাউল’ শব্দটি এসেছে ‘বাউর’ থেকে যার অর্থ পাগল। সংস্কৃত ‘ব্যাকুল’ বা ‘বাতুল’ শব্দ থেকে ‘বাউল’ শব্দের উদ্ভব বলে অনেকে মনে করেন, যার অর্থ উন্মাদ বা পাগল। ‘বায়ু’ শব্দের সাথে ল-প্রত্যয় যোগ করে বায়ুল > বাউল শব্দের উদ্ভব বলে অপর একটি অভিমত আছে। অপরমতে সুফিধারায় ‘বাআল’ নামের সাধক আছে এরা ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে থাকে। ‘বাউল’ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে পরবর্তী গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে। বাউল শব্দের উৎপত্তি নিয়ে নানা মতভেদ থাকলেও বাউল যে ভাবের পাগল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

‘বাউল’-শব্দের প্রথম ব্যবহার হয়েছিলো মালাধর বসু রচিত ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’। ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যে ‘বাউল’ শব্দের লিখিত উল্লেখ এরূপ পাওয়া যায়—

“মুকুল (ত) মাথার চুল নাটো যেন বাউল  
রাঙ্কসে রাঙ্কসে বুলে রণে।” (‘বাংলা লোকসঙ্গীতের ধারা’, পৃঃ-৩৩)

‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’-এ বাউল শব্দটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে নয়বার উচ্চারিত হয়েছে। ‘লোকসঙ্গীতের ধারা’ আমরা-এর উল্লেখ পাই—

- ১) “গোবিন্দেরে আজতাদিন ইহা আজি হতে  
বাউল্যা বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে।।”
- ২) “প্রভু কহে বাউলিয়া এঁছে কাঁহে কর?”
- ৩) “করিবার যোগ্য নয় তথাপি বাউলে কর  
কহিলে বা কেবা পাতেয়ায়?”
- ৪) “স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাউল।  
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিদ্ধুকুল।।”
- ৫) “আমি ত বাউল, আন্ কহিতে আন কহি।  
কৃষ্ণের মাধুর্যশোভে আমি যাই বহি।।”



- ৬) নীবিবন্ধ পড়ে মাস বিণা মূলে হয় দাসী  
বাউলী হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়।”
- ৭) তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।  
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্মনাশ।।”
- ৮) বাউলকে কহিও লোক হইল আউল  
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।”
- ৯) দশনেদ্রিয় শিষ্য করি মহাবাউল নাম ধরি  
শিষ্য লক্ষা করিল গমন।”

বাউলরা শ্রীচৈতন্যকে তাদের আদিগুরু মনে করতেন। শ্রীচৈতন্য পার্শ্বদ নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র নিম্ন শ্রেণিভুক্ত নেড়ানেড়িকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন, এরাই পরবর্তীকালে বাউল মতবাদের ও সম্প্রদায়ের জন্ম দেয় বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে এরূপ একটি মত প্রচলিত আছে।

‘বাউল’ ধর্মে নানা তত্ত্বের সান্নিবেশ ঘটেছে। দেহকেন্দ্রিক সাধনাই বাউল ধর্মের মূল কথা।

‘যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে দেহভাণ্ডে।’ দেহের আর অভ্যন্তরে যার বাস তিনি বৈষ্ণব সহজিয়ার কাছে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সুফী মতের সঙ্গে বাউলের যোগসূত্র রয়েছে। সুফীরা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা অন্তরের পবিত্রতা এবং সাংসারিক ভোগ সুখ অপেক্ষা বৈরাগ্যময় সন্ন্যাস জীবনকে অধিকতর কাম্য বলে মনে করতেন। সুফীদের মূল সাধনা ছিলো প্রেমের দ্বারা ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মিলন। যা আমরা বাউল গানে লক্ষ্য করি। সুফী ধর্মমতের সঙ্গে চৈতন্যদেব প্রভাবিত প্রবর্তিত গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতের দ্বারা বাউলরা যথেষ্ট প্রভাবিত ছিলেন। বাংলার কবির ধর্মের নানা দর্শনভাবনা বাউল গানে পাওয়া যায়। তাই অনেকে বাউল এবং ফকিরকে একই সম্প্রদায় বলেছেন। বাউল গানে নারী প্রাধান্যও লক্ষ্য করা যায়। তারা নারীদেহকে সাধনা বিশেষের হিসেবে বেছে নিয়েছে। নারী তাদের কাছে পণ্য নয়, পুতুল নয়, সাধনসঙ্গিনী হিসেবে তার গান—

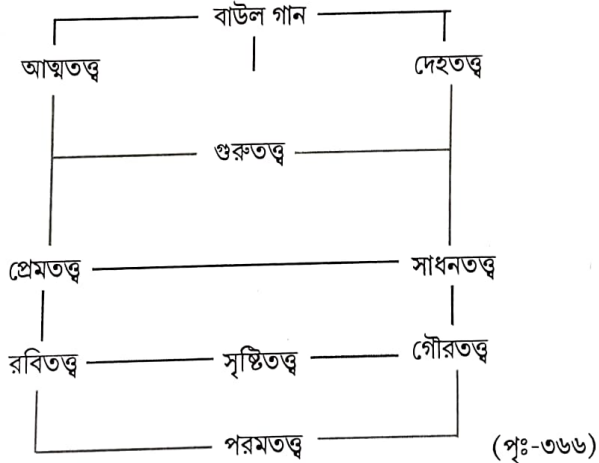
“মায়েরে ভজিলে হয় বাপের ঠিকানা

নিগুম বিচারে সত্য গেল তাই জানা।

পুরুষ পরোয়ারদেশার/অঙ্গে ছিল প্রকৃতি তার

প্রকৃতি প্রকৃতি সংসার/সৃষ্টি সব জনা।।”

বাউল গানের তত্ত্ব ভাবনাকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিখ্যাত গবেষক ডঃ ওয়াকিল আহমেদ তাঁর ‘বাংলা লোকসঙ্গীতের ধারা গ্রন্থে এই ভাব তত্ত্বকে একটি পরিরেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, নিম্নে তা প্রকাশ করা হলো—



বাউলের সাধনা জীবনের সাধনা। তারা নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ নয়। তাদের জীবনের দর্শন হলো ভিন্নতা থেকে অভিন্নতায় উত্তরণ, অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা, সংঘর্ষ থেকে সমন্বয় স্থাপন। বিদ্রোহ থেকে বিভেদের মাঝে মিলনের বার্তা। বাউলের কথা মানব মনের কথা, বাউলের সুর মানব মনের সুর, বাউলের দর্শন মানবতার দর্শন প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতবাদটি—

“বাউল মতবাদের বিকাশ হয় সামন্ত সমাজের শাসক শ্রেণির প্রতিকূল প্রতিবাদ হিসেবেই। বাউলরা প্রচলিত ধর্ম, জাতি বা





বর্ণবৈষম্য, দেবদেবী, পূজা আচার, নামাজ রোজা, মন্দির মসজিদ কর্তৃকিত সামন্ত সমাজের ধ্যান ধারণাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করতেন, এবং সেই ভাবধারাতেই আশুত তাদের মানের মানুষ এক নতুন মানবতাবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।" (বাংলা লোকসঙ্গীতের ধারা/ ওয়াফিল আহমেদ, পৃঃ ৩৮১)

ভারতের সামাজিক পরিপ্ততির দিকে যদি লক্ষ্য করি তাতলে দেখতে পাবো ভারতীয় সমাজজীবনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

বর্ণগত — ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

বর্ণগত — উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত

লিঙ্গগত— নারী ও পুরুষ

এই বিভাজন সমাজজীবনে নানা বিভেদের সৃষ্টি করে, নানা বৈষম্যের সৃষ্টি করে, বাংলায় জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার যে রূপ প্রকাশ পায় তা বৃহত্তর ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার একটি স্থানিক রূপ। কখন থেকে এই ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয় তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও 'ঋগ্বেদ' এ উৎস বলে অনেকের ধারণা। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাণ থেকে রাজক্য বা ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পদ্মদয় থেকে শূদ্রের জন্ম। এই তত্ত্ব প্রচারের মাধ্যমে সমাজের জাতি বৈষম্যতা স্পষ্ট হলে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় "মৈমনসিংহ গীতিকার" 'লীলাবন্ধু' পালার কথা—

"জন্মিয়া চণ্ডালের অন্ন সেইজন খায়

যে তারে সমাজে তুলে সেই জন ব্রাহ্মণ নয়।"

ধীরে ধীরে এই জাতি বৈষম্যতা ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড় করায়, কিন্তু তেমনভাবে কোলে প্রতিবাদ গড়ে ওঠেনি। কিন্তু 'বাউল' এমন এক প্রতিবাদী শ্রেণি যার মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে চির শাস্ত মিলনের বাণী। সব কুসংস্কারকে দূরে রেখে সৃষ্টি জীবন পথের দিশারী হয় এই বাউল সঙ্গীত—

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে

লালন বলে জাতের কিরূপ

দেখলাম না এই সংসারে।" (বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ/সনৎ কুমার মিত্র (সম্পাদঃ), পৃঃ-২৮)

বাউলরা জাতের বিচার মানে না। বাউলগানে বিভেদের বিরুদ্ধে লক্ষ্য করা যায় যার মধ্য দিয়ে সূচিত হয় যথার্থ মানবতার মন্ত্র।

তাই জাত-পাতের বিরুদ্ধে বিখ্যাত লালন কবি প্রতিবাদ করে বলেন—

"জাত গেল জাত গেল বলে

একি আজব কারখানা

সত্য পথে কেউ নয় রাজি

সব দেখি তানা না না

যখন তুমি ভবে এলে

তখন তুমি কি জাত ছিলে,

কি জাত হবা যাবার কালে

সেই কথা কেন বল মা।

ব্রাহ্মণ চণ্ডাল চামার মুচি

এক জনেতে সকল শুচি,

দেখে শুনে হয় না রুচি

যমে তো কাকেও খুবে না।

গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায়

তাতে জাতির কি ক্ষতি হয়—

লালন বলে, জাত করে কয়

এ ভ্রম তো আর গেল না।"

(বাংলা লোকসঙ্গীতের ধারা/ওয়াফিল আহমেদ, পৃঃ-৫৬২)

গুণু প্রতিবাদ নয়, মানুষের পৃথিবীতে মানবতা সঞ্চারের জন্য লালনের আক্ষেপও প্রকাশ পায়—

"এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে

যে দিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান জাতি গোত্র নাহি রবে।।

শোনায়ে লোভের বুলি



নেবে না কেউ কাঁধের ঝুলি

ইতর আতরাফ বলি

দূরে ঠেলে না দেবে।" (তদেব)

বাউল শাস্ত্রচার লোকচারকে অস্বীকার করে মানবিক আচারকে প্রতিষ্ঠা দেয়। তাদের মূল কথা—‘যাহা আছে ভাঙে তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।’ মন্দির মসজিদ গীর্জার মতো প্রতিষ্ঠানের তাদের প্রয়োজন নেই, তারা ভগবানকে সর্বত্র অনুভব করেন। তাদের ভগবানের অধিষ্ঠান আপন অন্তরে—

“আমার নাহি মন্দির কি মসজিদ

পূজা কি বকরিদ

ওরে তিলে তিলে মোর মক্কা কাশি

পথে পথে সুদিনা।”

বাউলরা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার অলীক কিছুর উপর ভরসা রাখতে চায় না। তারা বিশ্বাস করে মানুষের পৃথিবীতে শুধু মানুষেরই বাস, তাই মানুষকেই তারা অন্বেষণ করে—

“মানুষ হয়ে মানুষ চেনো

মানুষ হয়ে মানুষ মানো

মানুষ রতনধন

করো সেই মানুষের অন্বেষণ।”

এরই মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের জয়ধ্বনি।

জীবন কোথাও থেমে থাকে না, আপন বেগে বয়ে চলে, একান্তে কোথাও স্তব্ব করে দেয় তার পথ চলা। অথচ চারদিনের এই জীবন যাত্রায় কেন এত বিদ্বৈষ দাস্তা, হানাহানি অবিশ্বাস, আর জাত বিভেদ বাড়ল তা উপলব্ধি করেছে এবং খুঁজতে চেয়েছেন নতুন এক পথ। যে পথের যাত্রী শুধু মানুষ।

মানুষকে নির্বিশেষভাবে দেখার মধ্য দিয়েই যে প্রকৃত মানবতা সম্ভব বাউল তা বিশ্বাস করে আর মানুষই তাদের উপাস্য। তাই বাউলগানে মানবতার বাণী ধ্বনিত হয়েছে—

অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন যাই শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই।”

কিংবা—

‘মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে

সে কি অন্য তত্ত্ব মানে?

মাটির ঢিবি কাঠের ছবি

ভূত ভাবি সব দেব আর দেবী—

ভোলে না সে এসব রূপী

ও যে মানুষ রতন চেনে।”

এরই মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে সার্থক মানব সাধনার মন্ত্র। যে মন্ত্রের উৎসে রয়েছে বাউলের কঠোর সাধনা, সে সাধনায় ব্রতী হয়েছে অসংখ্য মানুষ, আর তারই মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছে মানবের জয়যাত্রার ধ্বনি, এখানেই বাউল ধর্মের সার্থক রূপের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

‘বাউল’ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে যে নামটি ছাড়া বিষয়টি প্রায় অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তিনি হচ্ছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদার মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথকে বাউল ভাবটা ভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিলো, তাঁর রচনায়। সাহিত্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ সরাসরিভাবে প্রথমে বাউলের সামিধ্য লাভ করেন, পৈতৃক জমিদারী রক্ষার জন্য যখন শিলাইদহ, পাবনা, নদীর ইত্যাদি অঞ্চল ভ্রমণে যান। বাউলের একতারা সুর, মাঝিদের নৌকার টানে টানে ভাটিয়ালীর সুর যুবক কবিকে মুগ্ধ করেছিলো—কবির অন্তরে অঙ্কিত হয় এক বিরীচ প্রতিমূর্তি বাউলের মন কাড়া সুরে মুগ্ধ হয়েছেন কবি। বাউলের ‘মনের মানুষ’ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথকে যে কতটা নাড়া দিয়েছিলো, তার সুস্পষ্ট উদাহরণ কবির ‘জীবনদেবতা’ তত্ত্ব। বাউল সম্বন্ধে কবির ভাষ্য—

“আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।”

(“বাউলগান বিষয়ে রবীন্দ্রভাষ্য”/“বাংলার বাউল ফকির”, পৃঃ-২৫১, সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাদিত))



রবীন্দ্র সৃষ্টিতে 'বাউল'-এর প্রভাব অতুলনীয়। রবীন্দ্র সঙ্গীতের দিকে যদি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো বাউল ভাবনার প্রভাব। প্রসঙ্গ নিম্নে উল্লেখ করা হলো বাউল ভাবনা সমৃদ্ধ কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত—

- ১) 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরি তায় সকলখানে।'
- ২) 'আমি কান পেতে রই ও আমার আপন হৃদয়গহণ দ্বারে বারে বারে।'
- ৩) 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—
- ৪) 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ও বন্ধু আমার।'
- ৫) 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।'
- ৬) 'এবার তোর মরাগাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাষা তরী।'
- ৭) 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে টেকাই মাথা

সঙ্গীত ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য শাখা অর্থাৎ গল্প উপন্যাস, নাটক, কবিতা ইত্যাদি বিভিন্ন শাখায় বাউলের প্রসঙ্গে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র নাটকে ঠাকুরদা, ধনঞ্জয় বৈরাগী, অন্ধ বাউল ইত্যাদি চরিত্র আমরা পাই—এগুলি সবই বাউল ভাবনায় সৃষ্ট—

'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে'

রবীন্দ্রনাথের 'প্রাণের মানুষ' আসলে বাউলের 'মনের মানুষ' কবির চিত্রা কাব্য, 'গোরা' উপন্যাস ইত্যাদি বাউল ভাবনার সমৃদ্ধ রূপ। বাউলকে যে রবীন্দ্রনাথ কত সুদৃঢ়ভাবে একাত্ম করেছিলেন তা প্রমাণ হিসেবে আমরা রবীন্দ্রনাথের বেশভূষার দিকে লক্ষ্য করতে পারি। বাউলের আলখাল্লা রবীন্দ্রনাথের পোশাক ছিলো। সুতরাং সব মিলেছে বলা যায়, মানব প্রেমিক রবীন্দ্রনাথও বাউলধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আজকের বৌদ্ধিক মহলে সাম্প্রদায়িক চেতনার কথা শোনা যায়, এ আলোচনা নতুন নয়। বিশ্বায়নের প্রভাবে আমরা যতই এক পা এগোচ্ছি ততই যেনো নিজের অজান্তে আরেক পা পিছিয়ে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত হিংসা, বিদ্বেষ, কুসংস্কার, দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ সংঘর্ষের মুখোমুখি হচ্ছে মানুষ। মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলি কোথাও যেনো আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সাম্প্রদায়িক বিভেদ দিন দিন যেনো বেড়েই যাচ্ছে। উত্তরণের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হচ্ছে, সঠিক পথে অন্বেষণ করতে চাইলেও বার বার ভ্রান্ত পথের যাত্রী হচ্ছে মানুষ। এ হেন গভীর অসুখের সময় সঠিক পথের দিশারী হতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে লোক ঐতিহ্যের কাছে অর্থাৎ শিকড়ের টানে শিকড় বিচ্ছিন্ন একটি গাছের বেঁচে থাকা যেমন অসম্ভব, তেমনি ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন মানুষের বেঁচে থাকাও অসম্ভব।

বাঙালির লোক ঐতিহ্যের মধ্যে বিশেষ প্রাণের সম্পদ হচ্ছে বাউল। বাউল এমনই এক সম্প্রদায় যারা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে একত্রিত করতে চেয়েছিলো। আজকের সাম্প্রদায়িক সমাজ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে একটি সৃষ্ট ভেদাভেদহীন সমাজ গঠন করতে চাইলে আমাদের ধারণ করতে হবে মানবতার মন্ত্র যা আমরা পাই, বাউলগানে। গণতান্ত্রিক 'ধর্ম' নিরপেক্ষ— ভারতবর্ষে, সৃষ্টভাবে গণতন্ত্রের সার্থক প্রতিষ্ঠা দিতে হলে ভারতবাসীকে মানবপূজায় ব্রতী হতে হবে, মানবতার দীক্ষা ভারতবাসীকে আলোর দিশা দেখাবে, আর এই মানবতা খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে বাউলদর্শনের কাছে বাউল-এর দ্বারাই যথার্থ মানবতার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাই আজ থেকে সব সাম্প্রদায়িক বিভেদ ত্যাগ করে ভারতবাসীর মূল মন্ত্র হবে—

"যথা যাই মানুষ দেখি, মানুষ দেখে জুড়াই আঁখি।"

গ্রন্থপঞ্জি—

- ১। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।
- ২। ড. ওয়াকিল আহমেদ— 'বাংলা লোকসঙ্গীতের ধারা', বাতায়ন প্রকাশ ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০।
- ৩। সুধীর চক্রবর্তী— (সম্পাদিত) 'বাংলার বাউল কবির' পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।
- ৪। শ্রী সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত)— 'বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ' পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।





## নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা

রিম্পা দাস

টি.ডি.সি. (ফল্ট সেমিস্টার)

আজ আমরা প্রাচীন যুগ থেকে যেহেতু ক্রমাগত আধুনিক যুগে চলে এসেছি ঠিক সেভাবে আমাদের এই অতি আধুনিক যুগে নারীজাতীর জীবনযাত্রাও ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে নারীরা ছিলেন গৃহবন্দী এখন আর ঠিক সে অবস্থা নেই। আজকের নারীরা শিক্ষার অধিকার পাচ্ছে ; পাচ্ছে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ। আগের মত মেয়েরা আর সংসারকেন্দ্রিক নয়, মেয়েরা বাইরের জগতে পা রাখতে পারছে। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর সুযোগ করতে পারছে।

প্রসঙ্গটি হচ্ছে, এই কি সেই স্বাধীনতা যা নারীরা চেয়েছিল, আজকের নারীরা গৃহকোণে বন্দি হয়ে থাকছে না ঠিকই কিন্তু আত্মপূর্ণ সেই স্বাধীনতা পূর্ণ স্বাধীনতার সমযোগী হয়ে উঠতে পারছে না। আমাদের সমাজে আজও সেই অতীতের ছাপ রয়ে গেছে। আমাদের সমাজ আজও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। সমাজের সকল শ্রেণির মধ্যে তা বরাবরই চোখে পড়ে। আজকের এই অত্যাধুনিক যুগেও মেয়েরা নির্যাতিতা হচ্ছে। 'কন্যা ক্রম হত্যা', 'ধর্ষণ', 'বধু নির্যাতন'-এর মত অত্যাচার প্রায় দিন দিন বেড়েই চলেছে। আজও সন্ধ্যা নামতেই পুরুষ স্বামীর অত্যাচারে নির্বিরোধ নারী সমাজ জর্জরিত হয়ে চলেছে। ১৯৪৭ সালে আমাদের ভারত স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু কোথাও যেন সেই স্বাধীনতা অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে তা নারীদের ব্যাপারে। পূর্বে যখন আমাদের দেশ কুশানন ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ তখন দুই মনীষী রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীজীবনকে এক নতুন আলোকে আলোকিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে সেই আলো আজ অন্ধকারে পরিণত হতে চলেছে বললে তা নেহাৎই ভুল হবে না। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই আজ নারীদের সংঘর্ষ করতে হচ্ছে। আজ আমাদের দেশ অনেক এগিয়ে চলেচে তবে পিছিয়ে রয়েছে দেশের নারী স্বাধীনতা। বাইরের জগতে পা রাখার আগে আজও নারীদের অনেক চিন্তা করতে হয়। আজও মা বাবারা মেয়েকে 'পরের ধন' বলে ভাবেন। একটি মেয়েকে ছোট থেকে বড় করে তারপর তার বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত কেউ তারা তাদের দায়িত্ব বলে ভাবেন। কোথাও যেন মেয়েকে আজও 'আপদ' ভাবা হয়। বিয়েটা হয়ে গেলে আপদ থেকে মুক্তি পেলে ভাবেন। কিন্তু এইসবের জন্য অবশ্য মা বাবাকে দায়ী করা ঠিক হবে না। এইসবের জন্য দায়ী আমাদের এই সমাজ। এই সমাজের ভয়েই মা বাবাদের আজ এইসব ভাবতে বাধ্য হতে হয়। প্রতিদিনের দৈনিক সংবাদপত্রে বা টেলিভিশনের চ্যানেলগুলিতে নারী নির্যাতনের খবর বরাবরই পাওয়া যায় কখন কখন তারা বড় বড় হরফের হেডলাইন হয়ে উঠে এবং আমরা বলি "ইসু খারাপ পাগে মেয়েটার লাগি", ব্যাস এতটুকুই। দু-চারজন মিলে সেই বিষয় নিয়ে একটু আধটু আলোচনা করি তারপরই তা বেমানাম ভুলে যাই। অতীতে যেহেতু আমাদের দেশ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সমাজের কবলে ছিল তখন সমাজের ভুল পথে চলার অনেক কারণ ছিল। কিন্তু আজকের শিক্ষিত সমাজের কাছে নিশ্চয় তা মোটেই আশা করা যায় না। কিন্তু আজকের শিক্ষিতরাও নারীদেরকে চরম লাঞ্ছনার চোখে দেখেন। অবাক লাগে আজকের শিক্ষিত মানুষের মনোভাব দেখে; সমাজের এই দুর্চারণের তারা যখন নারীদের উপরই দোষ চাপিয়ে দেয়। রাজনৈতিক দলগুলোও নারীমুক্তিকে একটা ইস্যু বানিয়ে তাদের বিজ্ঞাপন পেশ করে। 'নারীমুক্তি'কে একটা হাতিয়ার বানিয়ে তারা দেশের মহিলাদের মন জয় করতে চায়। রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরের দিকে কাদা ছুঁড়ে এবং একে অন্যের অপশাসনকে দায়ী করছে। কিন্তু কেন এই 'নারীমুক্তি' নিয়ে জায়গায় জায়গায় সভা সমিতি করে নারীমুক্তি বিষয়টি নিয়ে এত জল্পনা কল্পনা করে আলোচনা করা হয়। আমরা কি শুধু মুক্তিই চাই??? অবশ্যই না, আমরা শুধু মুক্তিই চাই না, আমরা কোন বিজ্ঞাপনের ইস্যু হতে চাই না। আমরা চাই স্বাধীনতা, "প্রকৃত স্বাধীনতা"। চাই সমঅধিকার, পুরুষতান্ত্রিক বা নারীতান্ত্রিক সমাজ নয়, চাই পুরুষ ও নারী মিলে এক সমতান্ত্রিক সমাজ যেখানে নারী পাবে নির্ভয়ে চলার অধিকার, পাবে এক মুক্তাঙ্গনের সমাজ। স্বপ্ন তাই স্বপ্নই থেকে যায়। প্রশ্ন তাই থেকে যায় প্রশ্ন হয়েই কবে আসবে সেই প্রভাত, সেই আলো?





## পৃথিবী সৃষ্টির অনুভব

সোনা কংসবণিক

টি.ডি.সি. (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

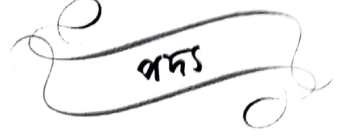
আজ থেকে কোটি বছর পূর্বের সেই কথা,  
ভালো করে ভাবলে একবার খারাপ হয় মাথা।  
না ছিল জীবজন্তু আর না ছিল লোক,  
পৃথিবীর জীবন ছিল কালোয় ভরা শোক।  
আগুনের মতো গরম ছিল পুরো তার দেহ,  
উদ্ভিদ ছাড়া বাঁচার মতো সাধ্য না আর কেহ।  
বাতাসকে অনুভব করে, উপস্থিতিতে জল,  
জীবরা বলে পৃথিবীতে কবে বসবাস করব বল?  
আলোর কোনো অভাব নেই দিন রাত্রি সমান,  
মানুষ বাঁচতে পারবে বলে কিছু ছিল না প্রমাণ।  
গ্যাসের ছিল যথেষ্ট অভাব, কীভাবে শেষ হয়,  
কয়েক বছর পরে যেন তার অভাবও দূর হয়।  
পৃথিবী এবার খুব সুন্দর দিন কাটাতে পারবে,  
সেও মনে ভাবে হঠাৎ মানুষ কবে আসবে।  
তার গরম মাটি ঠাণ্ডা হলো বেঁচে থাকার মতো,  
মানুষেরও জন্ম হলো কত কোটি শত।  
পৃথিবীর জীবনটাই যেন পাল্টে গেল পুরো,  
পৃথিবী খুবই সুন্দর যত পারো তাতে ঘুরো।।

## হৃদয় ক্ষরণ

ভাস্কর জ্যোতি দাস

টি.ডি.সি. (চতুর্থ সেমিস্টার)

বৃষ্টি ভেজা রৌদ্রে, আমার বিন্দ্র রজনী  
বৃষ্টির টাপুর-টুপুর.....  
যেন ফোটা নয়, এক অজানা সঙ্গীত  
আর পথচলা  
পথের পাথেয় বলতে শুধু হৃদয়।  
আমি বলতে পারি নে.....  
প্রকাশও হয় না, আমার অনুভবের ভাষ্যালিপি  
ভাঁজে আর বাঁকে লুকিয়ে আছে,  
কত কান্না আর ব্যথা।  
আমি প্রকাশ করিনি।  
আমি ব্যথার বিজ্ঞাপন দিই নি।  
আমাতে সর্বত্র আপাত শান্তি।  
'তুমি ভালো থেকেও  
আমি ভালো থাকতে চাই'



## সময়

দীপান্বিতা দাস

টি.ডি.সি. (চতুর্থ সেমিস্টার)

জীবনের শুরু, জীবনের শেষ  
মেনে চলে বিধির লিখন,  
সময় শুধু সাক্ষী দেয়  
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ।

শৈশব থেকে যৌবন,  
যৌবন থেকে বার্ধক্য।  
সব কিছুই পরিবর্তন করে  
সময়ের পার্থক্য।

আজ, কাল, পরশু,  
করে দিন চলে যায়  
সপ্তাহের পর মাস  
আর বছর হারিয়ে যায়।

যারা দেয় সময়ের মূল্য  
করে সময়মত কাজ  
চিন্তা ভাবনাহীন জীবনে  
করে তারাই রাজ।

জীবনের সব রূপের সাথে  
সময় করায় পরিচয়  
অতীতের ফল ভবিষ্যতে  
ফুটিয়ে তুলে সময়।

ছোট বড় কত ঘটনা  
প্রতিদিন ঘটে চলে  
সব কিছুই ধুয়ে যায়  
সময় নদীর জলে।।



## একা

মুনমুন বিশ্বাস

টি.ডি.সি. (চতুর্থ সেমিস্টার)

আমি বড় একা বড় অসহায়  
 রাত নিরুন্ম গভীর এত রাত  
 শান্ত পরিবেশ  
 নিঃশব্দ হয়ে আছে এই রাত  
 বার বার এই একটা ছবি আমার—  
 সামনে এসে দেয় ধরা  
 ক্ষণিকের জন্য ভুলতে পারি না. তোমায়  
 এই নিরুন্ম রাতে নেই কোন শব্দ  
 হয়ে আছে নিঃশব্দ  
 গভীর এই মিষ্টি রাতে শুধু  
 কানেতে আসছে এই দেয়াল ঘড়ির শব্দ  
 সবকিছু যেন মনে হয় নিঃশব্দ  
 আমি বড় একা বড় অসহায় হয়ে আছি  
 পারো যদি একবার এসে দিয়ো গো দেখা।

## মোদের এই কলেজ

ইফতিকার আলম বডলস্কর

টি.ডি.সি. (চতুর্থ সেমিস্টার)

মোদের কলেজে রয়েছেন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্র  
 এই কলেজের Discipline-ই হল আসল অস্ত্র।  
 মোদের কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে হয় Various প্রোগ্রাম  
 মোদের এই কলেজের আছে অনেক সুনাম।  
 মোদের এই রাধামাধব কলেজের আছে রঙিন ড্রেস  
 সেই ড্রেস গায়ে দিয়ে হই Always ফ্রেশ।  
 সবজু Shirt, কালো পেন্ট আছে Shoe কালো  
 লোকে বলে এই কলেজের পড়া অনেক ভালো।  
 সময়ে সময়ে হয়ে যায় কলেজের নির্বাচন  
 তাই নির্বাচিত হতে হলে Regular ক্লাসে থাকা প্রয়োজন।  
 জি.সি কলেজ, কাছাড় কলেজের মতো নাই কোনরকমের Fight  
 মোদের এই কলেজের ফলাফলের হার অনেক Bright  
 মোদের কলেজে বিচিত্র প্রোগ্রামে রয়েছে খেলার System.  
 তাই Participate করতে নাই বিন্দুমাত্রও Problem.  
 মোদের কলেজে বছরে বছরে হয় শিক্ষামূলক ভ্রমণ  
 তাই এই ভ্রমণের জন্যই প্রায়ই লেগে যায় Competition  
 মোদের কলেজের গুণাবলি পদ্যে কি আর ব্যাখ্যানো যায়  
 অন্যরা বলে এই কলেজ ভর্তি কেন হলাম না, হায়-হায়।

## অত্যাচারিত নারী

সরস্বতী কংসবণিক

টি.ডি.সি. (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

অত্যাচারিত নারী আজকের এই মৌনালম্বী পুরুষদের হাতে,  
 তাদের এই অত্যাচার কি আমরা মেনে নিব?  
 তারা আজ সমাজের হয়ে, নিকৃষ্ট প্রাণী।  
 আমাদের আর্তনাদ তারা শুনতে পায় না,  
 শুনতে পায় শুধু কান্নার ভিতরে তাদের হাসির খোরাক।  
 এই নির্মম অত্যাচার আমরা মেনে নিলে,  
 হয়ত একদিন এই সমাজটা অকূল সমুদ্রে তলিয়ে যাবে।  
 তারা আজ সমাজের পশুর থেকেও আবাদ প্রাণী,  
 পশুও ওদের দেখে ঘৃণা বোধ করবে।  
 হে, অত্যাচারিত নারী তোমরা জাগো,  
 তোমরা বলো, তোমরা প্রতিবাদ কর।  
 তোমাদের এই স্নেহ অপমান মেনে নিও না,  
 এই অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তিতে দণ্ডায়মান কর।  
 একদিন এই সমাজ উন্নত থেকে উন্নতম শিরে পৌছাবে,  
 তোমাদের যে আজ এই সমাজে বড়ই প্রয়োজন।  
 তাহলেই তো এই সমাজ সভ্য সমাজে রূপান্তর হবে।

## রূপসী বসন্ত

সুশীল দাস

টি.ডি.সি. (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

শীত শেষ হয়ে এলো  
 শুরু হল বসন্ত।  
 সারাবেলা কোকিল ডাকে  
 মুখে নাই অস্ত।  
 দিনগুলি দীর্ঘ হল  
 রাত হল ছোট।  
 কালো আকাশ থেকে পড়ে  
 বকবকে বৃষ্টির ফোটা।  
 গাছপালা ধোপঝাড়  
 সবুজে ঢাকা।  
 রূপসী বসন্ত যেন  
 রূপচিত্রে আঁকা।  
 বাসন্তীর ঢাক বাজে  
 ছড়িয়ে পড়ে সৌরভ।  
 পাখির গানে পূর্ণ হয়  
 বসন্তের গৌরব।



## বন্ধু

প্রিয়া পাল

টি.ডি.সি. (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

বন্ধু মানে খোলা আকাশ  
বন্ধু মানে মুক্তি,  
বন্ধু মানে সারাজীবন  
সঙ্গে থাকার চুক্তি।  
বন্ধু মানে একটু মন্দ  
অনেকখানি ভালো,  
বন্ধু মানে একসাথে  
হাজার তারার আলো।

## সপ্ত পুত্রের কাণ্ড

পূজা অধিকারী

টি.ডি.সি. (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

বড় পুত্র ঘুরে ফিরে  
মাগনা মাগনা খায়,  
দ্বিতীয় পুত্র সারাদিন  
ডুগডুগি বাজায়।  
তৃতীয় পুত্র কাজের জন্য  
ঘুরাঘুরি করে,  
চতুর্থ আর পঞ্চমে মিলে  
মারামারি করে।  
ষষ্ঠ পুত্র খুব পেটুক  
সারাদিন খায়,  
ছোট পুত্র প্রেমতলায়  
পান দোকানে যায়।  
সপ্ত পুত্রের সপ্ত রকমে  
বৈচিত্র্যের ভাণ্ড,  
পদ্যে কি আর ব্যাখ্যানো যায়  
সপ্ত পুত্রের কাণ্ড।।

## চলবো সবাই মিলে

অনুলেখা দেবরায়

উচ্চতর মাধ্যমিক (প্রথম বর্ষ)

দিনে পরে রাত আসে ভাই  
রাতের পরে দিন  
অনাদিকাল বিবর্তনে  
বাজায় মধুর বীন।  
আঁধার কালো দূর করে দেয়  
নতুন আশার আলো  
আলোর পরশ পেয়ে সবই  
লাগে দারুণ ভালো।  
আলোয় আলোয় জীবন ভরিয়ে  
চলবো সবাই মিলে  
জীবনটা ভাই কেটে যাবে  
আনন্দে হেসে খেলে।  
মৃদুমন্দ হাওয়ায় দোলে  
বসন্তেরই দিন  
আমরা সবাই মিলে থাকবো  
হব না কেউ হীন।



## খোলা চিঠি

যোগমায়া দাস

টি.ডি.সি. (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

মুক্ত মঞ্চের লীলা খেলায়, চলার পথে সাথী হারায়।  
বন্ধু হবে?  
সবকিছুতে সঙ্গ দেব, আগেই আমি দিলাম বলে।  
আপন করবে?  
সেই হারানো এই অবেলায়, ভালোবাসতে ভুলো না আমায়।  
কথা দেবে?  
এই জীবনের দুটি কথা বলব আমি হেসে।  
বিশ্বাস করবে?  
আমার সত্য, তোমার আনন্দ, ভাঙতে দিও না একটুও।  
হাত বাড়াবে?



## স্বপ্ন হারা

পুনম বর্মন  
টি.ডি.সি. (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

আমার স্বপ্ন....  
ভেঙেছে নিজেই, কোন অদৃশ্য ঝড়ে।  
আমার সুন্দর....  
পালিয়েছে কবেই, না জানি কার হোঁয়ার।  
আমার আশা....  
সে যে কাঙ্ক্ষিত অপেক্ষায় পাখা মেলায়।  
আমার আমি.....  
হৃদয়ের রিক্ততায় ভাষা হারায়।  
আমার মুগ্ধতা.....  
সেই আশ্রয়ের অলক্ষ্য ঠিকানা।

## শিক্ষক

রিম্পা দাস  
টি.ডি.সি. (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

কত যুগ ধরে তুমি জ্বলেছ  
জ্ঞানের আলো।  
তুমিই করেছ উজ্জ্বল এ উষার ভূমি  
একদিন যা ছিল কদাকার কালো।  
তোমার ছোয়ায় প্রাণ ফিরে পেল  
তপ্ত রুক্ষ সব জীবন।  
তুমিই তাদের আলোক দিতে  
সমস্ত জীবন করলে অর্পন।  
শিক্ষার অভাবে ভুগছিল যারা  
ছিল যারা একদিন সর্বহারা।  
জীবন পথে চলার  
তোমার এ শক্তি সত্যি দুর্বীর।

## কৃতজ্ঞতা

রাহুল দে  
টি.ডি.সি. (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

আজ কতটা বছর পার হয়ে গেল,  
তোমার পথ চলার।  
কত বাধা, বিঘ্ন পেরিয়ে এসে  
তুমি এখনো প্রদীপ জ্বলেছ আশার।  
তোমার মধ্য দিয়ে আমরা নবীন যাত্রী দল  
দেখতে পাই রঙীন আলো।  
তুমিই আমাদের করেছ আপন  
কাছে রেখে বুক ভরে বেসেছ ভালো।  
আমাদের পূর্বে যারা এসেছিল  
এই রঙীন স্বপ্নের আলয়ে।  
সময়ের স্রোতে তারা গেছে বয়ে  
তাদের হাতে আজ সোনার যাদুকটি  
জীবন হয়েছে তাদের আজ পরিপাটি  
তোমার কাছে আমরা চিরঋণী  
কি দিয়ে যে তা শোধ হবে  
এখনো পাইনি ভেবে মনে  
কি আছে, আমাদের যে দেব তোমায়,  
হে 'রাধামাধব', হৃদে ভরা অঞ্জলি দিলাম  
তোমার পায়।







## ছন্দহারা স্বস্তির নিশ্বাস

দিলু দাস

টি.ডি.সি. (চতুর্থ সেমিস্টার)

দিন বেগতিক  
রাত্রির অন্তহীন অন্ধকার  
সবই নিশ্চল!  
বড় সব পোক্তা গাছ  
ধরেছে ঘুণে  
সবই হয়েছে ধ্বংস নিশ্চয়।  
পথিক বাউল গান ধরে না  
রিক্ত হস্তে যুবক দল  
সব-ই নিজের পরিচয় জানে না।  
নদীর স্রোত গতি ধরে না  
পাশ্চাত্যের ছবি নিজে মডার্ন  
পুরাণে মন ধরে না।  
অসীম বুকের পাটা  
উচ্ছ্বল আবদার  
ডাঙায় চলে জোয়ারভাটা।  
মন মানতে চায় না  
নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখে না  
সবাই যে, হয়েছে মডার্ন।  
পূর্ব পাশ্চাত্য  
এক জয় জয়কার  
কিন্তু মাকে যে ঠিক চিনতে পারি না।  
চোখ ঝাপসা  
চশমায় আটা—  
দেখা যায় অনেক ছিদ্র পথ।  
এগিয়ে গিয়ে থেমে যায় সব  
পুরাণের ধার ঘেঁষা বলে?  
না, নিজেকে মডার্ন বলে—  
পুরাণকে বেঁধে রেখেছি তাতে।  
নিজের স্বপ্ন নিজে গড়াবে  
বর্তমানের অবস্থায়।  
স্বস্তির নিশ্বাস খুঁজে বেড়াই  
কাঁচা পাকা রাস্তায়।



## জননী

সুলতা রানি দাশ

উচ্চমাধ্যমিক (প্রথমবর্ষ)

তুমি দেখালে এই জীবনে  
আলো আমায়  
মনে মনে অনেক ভাবি  
মা তোমায়  
প্রেম ভালবাসা সবই ছিল  
আমার জন্য  
জন্ম নিয়ে তোমার কোলে  
হলাম ধন্য।  
অতীতের স্মৃতিগুলি যখনই  
মনে ভাসে  
মনে হয় মা তুমি আছ  
আমারি পাশে  
আমায় ছেড়ে অনেক দূরে  
চলে গেলে একা  
এই জীবনে আর কি পাব  
মা! তোমার দেখা?



## চার মাত্রায় পূর্ণ দু'মাত্রায় অপূর্ণ

ড: রাহুল চক্রবর্তী

প্রাক্তন ছাত্র, (সহযোগী অধ্যাপক) বাংলা বিভাগ,  
রাধামাধব কলেজ

সবুজ দেশে জন্মে দেখি

হাজার রকম কথা।

সাবধানেতে নেশা আছে

নজর দিয়ে গাঁথা।।

শ্যাওড়া গাছে পের্তনি থাকে

বলতো দিদিমারা।

আজকে যারা সুয়োরাগী

ধরবে তাদের কারা।।

গোল রঙেতে অক্ষ আছে

প্রেমের রাজনীতি।

চ্যাপ্টা রঙে আকাশ ছাওয়া

বাদলা হাওয়ার গীতি।।

হেসে খেলে বয়স বাড়ে

আশিতে ভীমরতি।

এদেশের সব স্বপ্ন জমে

মধ্যপথের গতি।।

হিসেব নিকেশ করবে কে রে

চলতি কথার মাঝে।

ব্রডগেজের ওই জবাবদিহি

থাকবে নানা কাজে।।

শিলচরের ওই অলিগলি

টুকরো ভাঙার ছানা।

সস্তা মানুষ মৌনব্রত

তাদের যে নেই দানা।।

রাজ আসেন রাজা ছিলেন

সবুজ দ্বীপের ধারা।

কর্তারা সব ফসল তোলে

বাস্তব যায় মারা।।

নির্জনেতে আলতো হাতে

মুখোশ ছাড়া ভূমি।

একটু ভেবো একটু দেখো

রক্ত শহিদ তুমি।।

রবীন্দ্রনাথ বেড়ান ঘুরে

বসে আছেন নজরুল।

শ্যাওড়াবনের অক্ষকারে

গড়ছে যারা ইস্কুল।।

দেশভাগে আর রাজনীতিতে

অভিভাবক শূন্য।

বরাক তবু বর্বর নয়

কবির শহর পূর্ণ।।

শক্তিপদ জেগে আছেন

আছেন বিমল কবি।

গর্ব করার মেধা নিয়ে

তাদের কাব্য ছবি।।

মৌন বটে অতন্দের ওই

তন্দ্ৰাবিহীন দেশে।

যোগাযোগহীন ভারতভূমি

নির্জনতারই বেশে।।

পরিচয় চাও বিদেশিরা

এ কেমন দেশ গড়ে।

শুষ্ক ভূমি অবহেলায়

হৃদয় আছে পড়ে।।

দেবার মত চকচকেতে

কি পারি আজ দিতে।

স্বাভিমান আর হৃদয় মাঝে

আপন করে নিতে।।

মূল্য শুধু শান্তির দ্বীপে

প্রতিশ্রুতির বন্যা।

জেগে আছেন অবহেলার

তিলোত্তমা কন্যা।



## हिन्दि विभाग

कविता

### मेरी माँ

**Kayser Ahmed Khan**

*TDC (2<sup>nd</sup> Semester)*

देखती यह उज्ज्वल आँखें,  
सबसे पहले जिस ज्योति को,  
भुँलु ना कभी इस, दिव्य किरण को,  
पालण-पीषण करती प्रेम भाव से सदा जी।

है मेरी जन्मदात्री,  
मेरी माँ के सिवाय और कीड़े न जानी।

हर-पल हर धही,  
स्नेह से भरी ममता तेरी,  
कैसे न माने तुझे कौड़े  
देती तु व्यार जब में रीड़े।

है मेरी रखवाली  
है भरी सी ममता की टोली ॥  
सव की है तु दुलारी  
है तु माँ मेरी ही व्यारी ॥





# Journal : An Insight Resource

**Sonali Choudhury (Biswas)**

*Librarian,  
Radhamadhab College Silchar.*

This paper on concept of a journal aims to help new authors getting started with the process. It is specially intended for the students wanting to write a paper for publication in a journal and to know about the factors and concepts related to an academic or a research journal, who in the near future would turn out to be prolific researchers and scientists of our country. This article discusses few important issues associated with journals like the problem of authorship, Copyright, open access journals, impact factor, embargo, ISSN, etc,

## WHAT IS A RESEARCH JOURNAL ?

A journal is an academic magazine published on a regular schedule. It contains articles written by experts in a particular field of study, based on research or analysis that the author, or authors, did, That research might include case studies or primary source research in various fields. Journal articles are written by experts or students of that particular field who have an advanced field-specific vocabulary and knowledge. A journal is a periodical publication intended to further the progress of science and development, usually by reporting new research. The publication of the results of research is an essential part of a scientific method of research. Although journal is sometimes used as a synonym for 'magazine', in academic use, a journal refers to a serious, scholarly publication that is reviewed and verified, in an attempt to ensure that articles meet the journal's standards of quality, and scientific validity.

For academic activities to contribute to the advancement of knowledge, they must be published in sufficient detail and accuracy to enable others to understand and elaborate the results.

The research journal is a tool which supports research based learning. It can be used to :

- \* Generate initial ideas
- \* Track your thinking
- \* Identify where your inspiration comes from
- \* Show how you are going to make use of the information



- \* Develop your concepts
- \* Explore potential outcomes
- \* Evaluate how successful they are

Indicate what you could take forward to inform your future generation.

Journals can be in print or digital formats, and many are available both ways. Some are available to reader at no charge, but some are meant for paid access. The Internet has revolutionized the production of, and access to, academic journals, with their contents available online via services subscribed to by academic libraries. Individual articles are subject-indexed in databases such as Google Scholar. Some of the smallest, most specialized journals are prepared in-house, by an academic department, and published only online ; such form of publication has sometimes been in the blog format. Currently, there is a movement in higher education encouraging open access, either via self archiving, whereby the author deposits a paper in a disciplinary or institutional repository where it can be searched for and read, or via publishing it in a free open access journal, which does not charge for subscriptions, being either subsidized or financed by a publication fee.

There are many reasons why academics may want to write a paper for a journal. Perhaps researchers have interesting (a) research findings ; (b) ideas or plans for new research ; (c) on going research, all of which they may want people to know about. It may take any of the following forms :

- \* Research findings
- \* Research plans
- \* Insight into research methods
- \* Insights into education & training
- \* Theoretical debate
- \* Overview of problem (lit. review)
- \* Review of book or film or software
- \* Report of a conference or event
- \* Opinion piece

### **AUTHORSHIP:**

An author is generally considered to be an individual who has made substantial intellectual contributions to a scientific investigating. Academic authorship of journal articles, books, and other original works is a means by which academics communicate the results of their scholarly work, establish priority for their discoveries, and build their reputation among their peers. Authorship of a work is claimed by those making intellectual contributions to the completion of the research described in the work, Upto the 20th century, sole authorship was the norm, and the one-paper-one-author model worked well for distributing credit. Today, shared authorship is common in most academic disciplines.

The person who actually writes the paper is significant. An individual who has written substantial sections of a paper that describe why the research problem is important, how it fits into the general knowledge available on the subject, and



how the new paradigms advance the state-of-the-art knowledge in that field, is usually considered the first author.

As a practical matter in the case of publications with multiple authors, one author should be designated as the lead author. The lead author assumes overall responsibility for the manuscript, and also often serves as the managerial and corresponding author, as well as providing a significant contribution to the research effort.

Potential authorship roles include individuals or groups who actually gather the data needed by the program in progress. A large percentage of scientific journal articles have multiple authors. The commonly accepted guideline for authorship is that one must have substantially contributed to the development of the paper. Rules for the order of multiple authors in a list vary significantly fields of research, but are generally consistent within a particular field. All co-authors of a publication are responsible for authorship by providing consent to authorship to the lead author, co-authors acknowledge that they meet the authorship criteria and that he should have participated sufficiently in the work to take responsibility for appropriate portions of the content. By providing consent to authorship to the lead author, co-authors are acknowledging that they have reviewed and approved the manuscript.

#### **COPYRIGHT :**

Traditionally, the author of an article was required to transfer the copyright to the journal publisher. Publishers claimed this was necessary in order to protect author's rights, and to coordinate permissions for reprints of other use. However, many authors, especially those active in the open access movement, found this unsatisfactory and have used their influence to affect a gradual move towards a license to publish instead. Under such a system, the publisher has permission to edit, print, and distribute the article commercially, but the author (s) retain the other rights themselves.

Even if they retain the copyright to an article, most journals allow certain rights to their authors. These rights usually include the ability to reuse parts of the paper in the author's future work, and allow the author to distribute a limited number of copies. In the print format, such copies are called reprints ; in the electronic format, they are called postprints. Some publishers, for example the American physical Society, also grant the author the right to post and update the article on the author's or employer's website and on free e-print servers, to grant permission to others to use or reuse figures, and even to reprint the article as long as no fee is charged. The rise of open access journals, in which the author retains the copyright, but must pay a publication charge, such as the public Library of Science family of journals, is another recent response to copyright concerns.



## OPEN ACCESS JOURNALS :

Open-access journals are scholarly journals that are available online to the reader "without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself." The main reason authors make their articles openly accessible is to maximize their research impact. An open access article is more likely to be used and cited than one behind subscription barriers. Some open-access journals are subsidized and are financed by an academic institution, learned society or a government information centre. Others are financed by payment of article processing charges by submitting authors, money typically made available to researchers by their institution or funding agency.

There have also been several modifications of open-access journals that have considerably different natures ; hybrid open-access journals and delayed open-access journals. Open-access journals (sometimes called "the gold road to open access") are one of the two general methods for providing open access. The other one (sometimes called the "green road") is self-archiving in a repository. The publisher of an open-access journal is known as an "open-access publisher", and the process, open-access publishing".

Open access (OA) means unrestricted online access to peer-reviewed scholarly research. Open access is primarily intended for scholarly journal articles, but is also provided for a growing number of theses, book chapters and scholarly monographs.

Open access comes in two degrees : gratis OA, which is free online access, and libre OA, which is free online access plus some additional usage rights. These additional usage rights are often granted through the use of various specific Creative Commons licenses.

The two ways authors can provide OA are (1) by self-archiving their journal articles in an OA repository, also known as 'green' OA, or by (2) by publishing in an open access journal, known as 'gold' OA.

With green OA authors publish in any journal and then self-archive a version of the article for gratis public use in their institutional repository, in a central repository (such as Pubmed Central), or on some other open access website.

With gold OA, authors publish in Open access journals, which provide immediate open access to all of their articles, usually on the publisher's website. "Hybrid" gold OA journals are subscription journals that provide gold open access only for those individual articles for which their authors (or their author's institution or funder) pay an open access publishing fee.

It may be mentioned here that the open access journals are made available in the Directory of Open Access Journals (DOAJ). Directory of Open Access Journals is a service that indexes and provides access to quality-controlled Open Access Journals and their articles. The Directory aims to be comprehensive and cover all open access scientific and scholarly journals that use an appropriate quality control system, and it will not be limited to particular languages or subject areas. The aim of the Directory is to increase the visibility and ease of use of open access scientific and scholarly journals thereby promoting their increased usage and



impact The DOAJ aims to be comprehensive and cover all open access scientific and scholarly journals that use a quality control system to guarantee the content. The address of DOAJ is <http://doaj.org>. which is mentioned here for your reference.

### **EMBARGO (ACADEMIC PUBLISHING) :**

In academic publishing, an embargo is a period during which online access to academic journals is not allowed to users who have not paid for access (or have access through their institution). The purpose of this is to protect the revenue of the publisher.

#### **Embargo may be in any of the following forms :**

- \* A 'moving wall' is a fixed period of months or years.
- \* A 'fixed date' is a particular time point that does not change.
- \* A 'current year' (or other period) is setting a time point on January 1 of the current year, so that all material earlier than that is available. Although fixed during the year, it will change each year.

Due to disciplinary differences in the "half-life" or relative demand of a scholarly article, some publishers are looking to enact longer embargo periods before an article can be made openly available on archives and repositories, in order to protect against profit losses. Standard embargo periods range between six and 24 months after initial publication. Some publishers have very restrictive embargoes while others are more liberal.

Embargo is helpful for researchers and libraries, because of its two important purposes :

- \* For delayed open access journals, the embargo separates the most recent period, for which a subscription is needed, from an older period, where a subscription is not needed and anyone may access the article. This can range from a few months to several years.

- \* In full-text databases, such as those of EBSCO Publishing or Proquest, it separates the most recent period, where only a title or abstract is available, from an older one, which is openly accessible.

Misconceptions surrounding embargo periods deduce the embargoes diminish access to information by withholding the current full text from journals, when in fact, embargoes increase access to information for journals that otherwise would not be available in aggregated database.

### **BIBLIOMETRIC STUDY OF JOURNALS :**

Bibliometrics is a set of methods to quantitatively analyze academic literature. Citation analysis and content analysis are commonly used bibliometric methods. While bibliometric methods are most often used in the field of library and information science, bibliometrics have wide applications in other areas. Bibliometric methods have been used to trace relationships amongst academic journal citations. Many research fields use bibliometric methods to explore the number of citations and





hence the impact of their field, the impact of a set of researchers, the impact of a particular paper or the impact of a journal. The most common term used for this is 'Impact Factor'. Let us try to discern what an Impact Factor is.

### IMPACT FACTOR :

The impact factor (IF) of an academic journal is a measure reflecting the average number of citations to recent articles published in the journal. It is frequently used as a proxy for the relative importance of a journal within its field, with lower ones. The impact factor was devised by Eugene Garfield, the founder of the Institute for Scientific Information. Impact factors are calculated yearly starting from 1975 for those journals that are indexed in the Journal Citation Reports. The concept of IF was first introduced by Eugene Garfield in 1955. IF is an important indicator for the evaluation of research performance and is widely used for academic evaluation in various fields. Garfield defined IF as the ratio of number of citations received by source items in a particular year to the number of source items published over a fixed period of time in a particularly periodic publication, say a journal. 'Source items' mentioned in the definition include original articles, reports, letters, notes, review articles, etc. This particular IF, popularly known as JCR Impact Factor or SCI Impact factor is used all over the world.

The compilation of Science Citation Index (SCI) was the first factor/task which led to the idea of IF in the mind of Garfield., who was assigned with the task of compiling the index for science periodicals, and the problem to him was the criteria of selection. Ultimately the criteria that was fixed were that the serial should be a research or review periodical, it should be peer-reviewed, it should be international in scope and it should be very regular as to its publication schedule.

The Impact Factor is predominantly used to compare different journals within a certain field. Historically bibliometric methods have been used to trace relationships amongst academic journal citations. Citation analysis, which involves examining an item's referring documents, is used in searching for materials and analyzing their merit.

Data from citation indexes can be analyzed to determine the popularity and impact of specific articles, authors, and publications. Using citation analysis to gauge the importance of one's work is a significant part of the tenure review process. Information scientists also use citation analysis to quantitatively assess the core journal titles and watershed publications in particular disciplines ; interrelationships between authors from different institutions and schools of thought ; and related data about the sociology of academia. Some more pragmatic applications of this information includes the planning of retrospective bibliographies, "giving some indication both of the age of material used in a discipline, and of the extent to which more recent publications supersede the older ones ;" indicating through high frequency of citation which documents should be archived ; comparing the coverage of secondary services which can help publishers gauge their achievements and competition, and can aid librarians in evaluating "the effectiveness of their stock".



### Calculation of Impact Factor :

In any given year, the impact factor of a journal is the average number of citations received per paper published in that journal during the two preceding years. For example, if a journal has an impact factor of 3 in 2014, then its papers published in 2012 and 2013 received 3 citations each on average in 2014. The 2014 impact factor of a journal would be calculated as follows :

A= the number of times that articles published in that journal in 2012 and 2013, were cited by articles in indexed journals during 2014.

B= the total number of "citable items" published by that journal in 2012 and 2013. ("Citable items" are usually articles, reviews, proceedings, or notes ; not editorials or letters to the editor.) 2014 impact factor = A/B

(Note that 2014 impact factors will actually be published in 2015 they cannot be calculated until all of the 2014 publications have been processed by the indexing agency.)

New journals, which are indexed from their first published issue, will receive an impact factor after two years of indexing ; in this case, the citations to the year prior to Volume I, and the number of articles published in the year prior to Volume I are known zero values. Journals that are indexed starting with a volume other than the first volume will not get an impact factor until they have been indexed for three years. Annuals and other irregular publications sometimes publish no items in a particular year, affecting the count. The impact factor relates to a specific time period ; it is possible to calculate it for any desired period, and the Journal Citation Reports (JCR) also includes a five-year impact factor.

### PEER REVIEW :

Scientific journals contain articles that have been peer reviewed, in an attempt to ensure that articles meet the journal's standards of quality, and scientific validity. Peer review is the evaluation of work by one or more people of similar competence to the producers of the work (peers), It constitutes a form of self-regulation by qualified members of a profession within the relevant field, Peer review methods are employed to maintain standards of quality, improve performance, and provide credibility. In academia peer review is often used to determine an academic paper's suitability for publication.

Peer review can be categorized by the type of activity and by the field or profession in which the activity occurs

Professional peer review focuses on the performance of professionals, with a view to improving quality, upholding standards, or providing certification. Professional peer review activity is widespread in the field of health care, where it is best termed Clinical peer review. Further, since peer review activity is commonly segmented by clinical discipline, there is also physician peer review, nursing peer review, dentistry peer review, etc. Many other professional fields have some level of peer review process accounting, law, engineering (e.g., software peer review is common in decisions related to faculty advancement and tenure. Peer review is used in education to achieve certain learning objectives,



particularly as a tool to reach higher order processes in the affective and cognitive domains as defined by Bloom's Taxonomy. This may take a variety of forms, including closely mimicking the scholarly peer review processes used in science and medicine.

### Scholarly peer review :

Scholarly peer review (also known as **refereeing**) is the process of subjecting an author's scholarly work, research, or ideas to the scrutiny of others who are experts in the same field, before a paper describing this work is published in a journal. Peer review in its current form is relatively recent ; the journal Nature instituted formal peer review only in 1967. The work may be accepted, considered acceptable with revisions, or rejected. peer review requires a community of experts in a given (and often narrowly defined) field, who are qualified and able to perform reasonably impartial review. Impartial review, especially of work in less narrowly defined or inter disciplinary fields, may be difficult to accomplish ; and the significance (good or bad) or an idea may never be widely appreciated among its contemporaries. Although generally considered essential to academic quality, and used in most important scientific publications, peer review has been criticized as ineffective, slow, and is often misunderstood (also see anonymous peer review and open peer review).

Pragmatically, peer review refers to the work done during the screening of submitted manuscripts and funding applications. This process encourages authors to meet the accepted standards of their discipline and reduces the dissemination of irrelevant findings, unwarranted claims, unacceptable interpretations, and personal views. Publications that have not undergone peer review are likely to be regarded with suspicion by academic scholars and professionals.

It is difficult for authors and researchers, whether individually or in a team, to spot every mistake or flaw in a complicated piece of work. This is not necessarily a reflection on those concerned, but because with a new and perhaps eclectic subject, an opportunity for improvement may be more obvious to someone with special expertise or who simply looks at it with a fresh eye. Therefore, showing work to others increases the probability that weaknesses will be identified and improved. At the end of the day, the decision whether or not to publish a scholarly article, or what should be modified before publication, goes with the editor of the journal to which the manuscript has been submitted. Similarly, the decision whether or not to fund a proposed project rests with an official of the funding agency. These individuals usually refer to the opinion of one or more reviewers in making their decision. Thus it is normal for manuscripts and grant proposals to be sent to one or more external reviewers for comment.

Reviewers are typically anonymous and independent, to help foster unvarnished criticism, and to discourage cronyism in funding and publication decisions. Since reviewers are normally selected from experts in the fields discussed in the article, the process of peer review is considered critical to establishing a reliable body of research and knowledge. Scholars reading the



published articles can only be expert in a limited area ; they rely, to some degree, on the peer-review process to provide reliable and credible research that they can build upon for subsequent or related research. As a result, significant scandal ensues when an author is found to have falsified the research included in an article, as many other scholars, and the field of study itself, may have relied upon the original research.

#### Procedure :

In the case of proposed publications, an editor sends advance copies of an author's work or ideas to researchers or scholars who are experts in the field (known as "referees" or "reviewers"), nowadays normally by e-mail or through a web-based manuscript processing system. Usually, there are two or three referees for a given article.

These referees each return an evaluation of the work to the editor, noting weaknesses or problems along with suggestions for improvement. Typically, most of the referees' comments are eventually seen by the author ; scientific journals observe this convention universally. The editor, usually familiar with the field of the manuscript (although typically not in as much depth as the referees, who are specialists), then evaluates the referees' comments, her or his own opinion of the manuscript, and the context of the scope of the journal or level of the book and readership, before passing a decision back to the author (s), usually with the referees' comments. Referees' evaluations usually include an explicit recommendation of what to do with the manuscript or proposal, often chosen from options provided by the journal or funding agency. Most recommendations are along the lines or the following :

- \* to unconditionally accept the manuscript or the proposal,
- \* to accept it in the event that its authors improve it in certain ways,
- \* to reject it, but encourage revision and invite resubmission,
- \* to reject it outright.

During this process, the role of the referees is advisory. The editor is typically under no obligation to accept the opinions of the referees, though she will most often do. Furthermore, in scientific publication, the referees do not act as a group, do not communicate with each other, and typically are not aware of each other's identities or evaluations. Proponents argue that if the reviewers of a paper are unknown to each other, the editor responsible for the paper can more easily verify the objectivity of the reviewers. There is usually no requirement that the referees achieve consensus, what the decision instead often made by the editor based on her best judgement of the arguments. The group dynamics are thus substantially different from that of a jury.

In situations where multiple referees disagree substantially about the quality of a work there are a number of strategies for reaching a decision. When an editor receives very positive and very negative reviews for the same manuscript, the editor will often solicit one or more additional reviews as a tie-breaker. As another strategy in the case of ties, editors may invite authors to reply to a referee's



criticisms and permit a compelling rebuttal to break the tie. If an editor does not feel confident to weigh the persuasiveness of a rebuttal, the editor may solicit a response form the referee who made the original criticism. An editor may convey communications back and forth between authors and a referee, in effect allowing them to debate a point. Even in these cases, however, editors do not allow multiple referees to confer with each other, though each reviewer may often see earlier comments submitted by other reviewers. The goal of the process is explicitly not to reach consensus or to persuade anyone to change their opinions, but instead to provide material for an informed editorial decision. Some medical journals, usually following the open access model, have begun posting on the Internet the pre-publication history of each individual article, from the original submission to reviewers' reports, author's comments, and revised manuscripts.

Traditionally, reviewers would often remain anonymous to the authors, but this standard varies both with time and with academic field. In some academic fields, most journals offer the reviewer the option of remaining anonymous or not, or a referee may opt to sign a review, thereby relinquishing anonymity. Published papers sometimes contain, in the acknowledgments section, thanks to anonymous or named referees who helped improve the paper.

Most university presses undertake peer review of books. After positive review by two or three independent referees, a university press sends th manuscript to the press's editorial board, a committee of faculty members, for final approval.

## ISSN :

An International Standard Serial Number (ISSN) is a unique eight-digit number used to identify a periodical publication at a specific media type. It is internationally accepted as a fundamental identifier for distinguishing between identical serial titles and facilitating checking and ordering procedures, collection management, legal deposit, interlibrary loans etc. When a periodical is published, with same content, in two or more different media, a different ISSN is assigned to each media type-in particular the print and electronic media types, named **print ISSN (p-ISSN)** and **electronic ISSN (e-ISSN or eISSN)**.

The ISSN system was first drafted as an ISO international standard in 1971 and published as ISO 3297 in 1975. The ISO subcommittee TC 46/SC 9 is responsible for the standard. To assign a unique identifier to the serial as content (linking among the different media), ISSN-L must be used, as defined by ISO 3297 : 2007. Let us try to read through the following lines to comprehend about ISSN.

## What is an ISSN?

An ISSN is an 8-digit code used to identify newspapers, journals, magazines and periodicals of all kinds and on all media print and electronic. ISSN is a worldwide identification code used by publishers, suppliers, libraries, information services, bar coding systems, union catalogues, etc. for citation and retrieval of serials. The benefits include international publicity and recognition



of the serial by automatic inclusion in the International Serials Directory Database.

The ISSN role is to identify a publication. It is a digital code without any intrinsic meaning. It does not include any information about the origin or contents of the publication, nor does it guarantee the quality or validity of the contents. The ISSN is associated with the title of the publication. If the publication is modified significantly, a new ISSN must be assigned.

It is worth knowing that an ISSN is assigned completely free of charge. ISSN are assigned at no cost according to the ISO Standard 3297 : 2007 that defines the identification of serials and other continuing resources by the ISSN.

Which publications are concerned by an ISSN?

An ISSN (International Standard Serial Number) identifies all continuing resources, irrespective of their medium (print or electronic) :

- \* newspapers,
- \* annual publications (reports, directories, lists, etc.)
- \* journals,
- \* magazines,
- \* collections,
- \* Websites,
- \* databases,
- \* blogs, etc.

In many countries, an ISSN is mandatory for all publications subject to the legal deposit.

Who assigns ISSN?

ISSN for a periodical is assigned by the International Centre for the registration of serial publications-CIEPS or the ISSN International Centre. The purpose of the CIEPS-or ISSN International Centre, an intergovernmental organization- is to manage the International Serials Data System (ISDS), an automated registration system for serial publications in all disciplines. The ISSN International Centre was officially created in Paris in 1976. under the terms of an agreement signed between UnESCO and France, the host country of the International Centre. Today there are 88 member countries.

The ISSN International Centre coordinates the activities of member countries. It is responsible for maintaining and publishing the ISSN International Register. It is also responsible for assigning ISSNs to international publications issued in countries that do not have an ISSN National Centre.

What form does an ISSN take ?

The ISSN takes the form of the acronym ISSN followed by two groups of four digits, separated by a hyphen. The eighth digit is a check digit calculated according to a modulus 11 algorithm on the basis of the 7 preceding digits ; this eighth control digit may be an "X" if the result of the computing is equal to "10", in order to avoid any ambiguity.

e.g.:

- \* ISSN 0317-8471
- \* ISSN 1050-124X



### Illustration :

The ISSN is the International Standard Serial number, which allows the identification of serial publications. It's a standard numeric code made up of 8 digits whose last digit is a control character that may be the letter "X", Please refer to the illustration below in Figure 1.

ISSN number

Issue Number

Prefix for ISSN

ISSN number minus check digit

Sequence variant

EAN check digit

Figure 1 : An ISSN illustration

Where is it displayed?

For a print publication, the ISSN should be shown preferably, in the upper right corner of the cover, failing that, on the pages where editorial information is shown (publisher, frequency, colophon, etc.). For a publication in electronic media, the ISSN should be shown on the homepage or on the main menu, if it is an online publication, on any part visible to the naked eye (microfiche header, CD-Rom or DVD label, box, case, etc.), if the publication is on a physical medium. If a publication is identified by ISSN and ISBN, both of these identifiers should be mentioned.

Practical uses of the ISSN

Beyond its role of identifying titles, the ISSN is an essential daily tool for all serial publication professionals.

\* Electronic archiving

\* Cataloguing

\* Distribution, subscriptions and management

### Electronic archiving :

The ISSN International Register is the worldwide catalogue for serial publications, Serial publications are registered in it exhaustively.

Consequently, the ISSN is a bibliographical tool : Students, researchers, writers of summaries and librarians can use it to give the precise references of a serial publication.

### Cataloguing :

Used as a standardized identification digital code, the ISSN is used in IT applications to : update files, establish links between different files, and search for and exchange data.

### Distribution, subscriptions and management :

**Libraries use the ISSN to :**

identify titles,

order and verify serial publications, and

claim missing issues.



The ISSN simplifies lending operations between libraries, as well as controls and verifications on union catalogues. The ISSN must be used precisely to ensure Open URL-based links are resolved correctly. The ISSN is a practical and cost-effective communication tool between publishers and suppliers. It helps commercial distribution systems to be fast and efficient.

### The ISSN International Register :

The ISSN International Register is published by the ISSN International Centre. It lists all ISSNs assigned to serial publications, It is the most complete reference source in the world for the identification of serial publications.

- \* The ISSN International Register in figures
- \* Exhaustive data
- \* Access the ISSN International Register

It is important to mention here that India is also a member of the ISSN Network, the details are as given below.

Indian National Centre for ISSN

Country code : IND

Centre code : 20

Indian National Centre for ISSN

**NISCAIR**

14, Satsang Vihar Marg

Special Institutional Area

New Delhi-110067

New Delhi

Tel : +91-11.2651 6672/2653 4535

Website : <http://nsl.niscair.res.in/issn.isp>

### Applying for ISSN :

Any new print or electronic journal whose first issue is ready for publication or already published can apply for ISSN. Moreover, and existing serial publication which does not have ISSN or changed serial title (s) whose old title had already and ISSN can also apply for an ISSN. One can obtain ISSN by applying through filled datasheet, download from [www.niscair.res.in](http://www.niscair.res.in) to Head, National Science Library, National Institute of Science Communication and Information Resources (NISCAIR), 14-Satsang Vihar Marg, New Delhi-110067.

In order to obtain an International Standard Serial Number (ISSN) for your serial you should download the application from available in the above mentioned website, fill the datasheet along with a specimen copy of the serial in case of print version or a copy of homepage in case of online version and send it to the Head, National Science Library, Indian National Centre for ISSN, c/o NISCAIR, 14 Satsang Vihar Marg, New Delhi-110067, Contact No. 011-26516672.

For requesting an ISSN through the ISSN International Centre, you may refer to the guidelines available on the ISSN International Centre's website at :

<http://www.issn.org/services/requesting-an-issn/>.





## CONCLUSION :

Publication in a reputable, peer reviewed journal should be the goal of every researcher, as this provides the most effective and permanent means of disseminating information to a large audience. When human subjects participate in research and subsequently in a journal writing, it is on the understanding that they are assisting with the creation and dissemination of knowledge, presenting researchers with the responsibility to communicate the outcome of their research. The article is a small endeavour to elucidate the fundamental ideas concerning an academic journal (or a research journal) which can assist in the preparation of a paper for a journal. Writing in a journal is considered as imperative in the academic world because articles published in peer reviewed journals are likely to remain a very important means of disseminating information and spreading knowledge through the research findings for the foreseeable future. It is equally important for Libraries and Information Centres, whose ultimate aim is to disseminate information.

## Bibliography :

1. Sen, B.K. Impact Factor. *Annals of Library and Information Studies*. 57 (Sept 2010) 291-295.
2. Thyer, Bruce.A, *Preparing Research Articles*. Oxford : Pergamon Press. 2008.
3. R. Berry, *How to Write a Research Paper*. Oxford : Pergamon Press, 1986.
4. <http://www.oxfordscholarship.com/>
5. <http://wustl.edu/policies/authorship.html>
6. [en.wikipedia.org/wiki/Open\\_access\\_journal](http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access_journal)
7. <http://nsl.niscair.res.in/issn.jsp>
8. <http://en.wikipedia.org/wiki/Bibliometrics>
9. [en.wikipedia.org/wiki/International\\_Standard\\_Serial\\_Number](http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number)
10. <http://www.issn.org/>





## List of the Candidates who secured Highest marks in the Council & University Examination

### RADHAMADHAB COLLEGE

	Name	Examination	Year	University/ Council	Position
1.	Sri. Sibabrata Bhattacharjee	Pre-University Arts	1976	G.U	10th
2.	Smt. Paramita Das	B.A (Hons) Eco	1990	G.U	1st Class First
3.	Sri. Debotosh Chakraborty	B.A (Hons) Pol.Sce	1997	A.U.S	1st Class First
4.	Sri. Santunu Das	B.A (Hons) Edu	1998	A.U.S	1st Class First
5.	Smt. Anjana Sengupta	B.A (Hons) Hist	1998	A.U.S	1st Class First
6.	Sri. Anjan Chatterjee	B.A (Hons) Eco	1999	A.U.S	1st Class First
7.	Sri. Santosh Akura	H.S (Final)	2003	AHSEC	Highest Mark-in Bengali (80%)
8.	Smt. Manidipa Goswami	B.A (Hons) Beng	2011	A.U.S	1st Class First
9.	Sri. Ashim Kumar Das	B.Com	2011	A.U.S	First Batch & 1st Div.
10.	Smt. Dipanwita Das	H.S. (Final)	2012	AHSEC	STAR MARK 76.4%
11.	Smt. Mitali Biswas	B.A. (Hon's) Bengali	2012	A.U.S	1st Class 2nd
12.	Smt. Sonali Chakraborty	H.S. Final	2014	AHSEC	STAR MARK 86.4%
13.	Sri Anjay Roy	H.S. Final	2014	AHSEC	STAR MARK 81.6%
14.	Smt. Sureshwaree Dutta	H.S. Final	2014	AHSEC	STAR MARK 79.4%
15.	Sri. Durjay Nandi	H.S.Final	2014	AHSEC	STAR MARK 75.2%



## List of the Teaching, Library & Administrative Staff

Principal : Dr. Pronoy Ranjan Deb, M.Sc., Ph.D.  
Vice Principal : Dr. Nani Gopal Debnath, M.A., Ph.D.

### TEACHING FACULTY (ARTS)

#### Department of Bengali

Dr. Nanigopal Debnath, M.A., Ph.D.	Associate Professor & H.O.D.
Dr. Rahul Chakraborty, M.A., Ph.D.	Associate Professor.
Dr. Kalipada Das, M.A., Ph.D.	Assistant Professor.
Dr. Abhijit Choudhury, M.A., Ph.D.	Part Time Lecturer.

#### Department of Economics

Dr. Manoj kr. Paul, M.A., M.Phil, Ph.D.	Associate Professor (online) & H.O.D.
Sri Sastri Ram Kachari, M.A.	Assistant Professor.
Sri Rahul Sarania, M.A.	Assistant Professor.
Dr. (Mrs.) Nabanita Debnath, M.A.Ph.D.	Assistant Professor.

#### Department of Education

Dr. Bani Burman Roy, M.A., Ph.D.	Associate Professor & H.O.D.
Sri Surat Basumatary, M.A.	Assistant Professor.

#### Department of English

Dr. (Mrs.) Kankana Nath, M.A.Ph.D	Associate Professor & H.O.D.
Mrs. Arundhati Dutta Choudhury, M.A., M.Phil.	Assistant Professor.
Sri. Arunabha Bhattacharjee, M.A., M.Phil.	Assistant Professor.

#### Department of History

Dr. Debashish Roy, M.A., Ph.D.	Associate Professor & H.O.D.
Sri Sudarshan Gupta, M.A.	Assistant Professor.

#### Department of Philosophy

Dr. Jashobanta Roy, M.A., M.Phil, Ph.D.	Associate Professor & H.O.D.
Dr. (Mrs.) Ruma Nath Choudhury, M.A., Ph.D.	Assistant Professor.



**Department of Manipuri**

Mrs. A. Joymoti Singh, M.A.  
Sri. Ch. Manikumar, M.A. (Double)

Associate Professor & H.O.D.  
Assistant Professor.

**Department of Political Science**

Dr. Prabhat Kumar Sinha, M.A., Ph.D.  
Dr. (Mrs.) Ashima Roy, M.A., Ph.D.  
Sri Jiban Das, M.A., M.Phil.  
Sri Bidhan Burman, M.A., M.Phil.

Associate Professor & H.O.D.  
Associate Professor.  
Assistant Professor.  
Assistant Professor.

**TEACHING FACULTY (COMMERCE)**

1. Sri Rupam Roy, M.Com
2. Dr. Ashishtaru Roy, M.Com, Ph.D.
3. Sri Arup Paul, M.Com.
4. Smt. Kalyani Choudhury, M.A.

**CENTRAL LIBRARY STAFF**

1. Mrs. Sonali Choudhury, M. LIsc., M.Phil. Librarian
2. Smt. Monidipa Das Library Assistant
3. Sri Galim Gangmei Library Bearer
6. Smt Supriya Roy Library Assistant

**ADMINISTRATIVE STAFF**

1. Sri Pranab Kr. Dey Senior Assistant cum Accountant
2. Sri Purnendu Das Senior Assistant cum Cashier
3. Sri Kanailal Bhattacharjee Junior Assistant
4. Sri Surajit Roy Junior Assistant
5. Sri Gauri Sankar Dhar Junior Assistant
6. Sri Peter Noah Rongmei Junior Assistant
7. Sri Babul Chandra Das Grade-IV
8. Sri Shankar Rabidas Grade-IV
9. Sri Sailen Das Grade-IV
10. Kelhoukri Rutsa Lab bearer
11. Sri Basab Das Poddar Grade-IV
12. Smt. Jayashree Debnath Office Attendant
13. Smt. Jyotsna Das Office Attendant.

*The Students Union for the session 2013-14 of Radhamadhab College, Silchar has been formed with the following Office Bearers & Prof-in-Charge*

President :- Dr. Pronoy Ranjan Deb  
Union-in-Charge :- Sri Jiban Das



Sl.No.	Post	Name of the Office Bearer	Class	Prof. in Charge	Supervising Officer
1.	Vice-President	Shambu Das	B.A. 6 <sup>th</sup> Sem.	Sri Jiban Das	Dr. Rahul Chakraborty
2.	General Secretary	Bhaskariyoti Das	B.A. 4 <sup>th</sup> Sem.	Sri Jiban Das	Dr. Rahul Chakraborty
3.	Secy. Girls Common Room	Dipshikha Sarkar	B.A. 2 <sup>nd</sup> Sem.	Smt. Arundhati Dutta Chaudhary	Dr. Ashima Roy
4.	Secy. Boys Common Room	Rahul Acharjee	B.A. 6 <sup>th</sup> Sem.	Sri Bidhan Barman	Dr. Nani Gopal Debnath
5.	Secretary, Sports	Chayan Malakar	B.A. 6 <sup>th</sup> Sem.	Sri Surat Basumatary & Sri Rahul Sarania	Dr Probhat Kumar Sinha
6.	Secretary Book Bank	Shubhojit Nath	B.A. 4 <sup>th</sup> Sem.	Sri Sastri Ram Kachari	Dr. Jashobanta Roy
7.	Editor College Magazine	Dilu Das	B.A. 4 <sup>th</sup> Sem.	Dr. Debashish Roy	—
8.	Secretary Music & Drama	Kali Chandra Das	B.A. 4 <sup>th</sup> Sem.	Sri Sudarshan Gupta & Dr Ruma Nath Chaudhury	Dr. Bani Burman Roy
9.	Secretary Debate	Dipika Singha	B.A. 6 <sup>th</sup> Sem.	Dr. Kalipada Das	Dr. Nani Gopal Debnath
10.	Secretary Social Service	Abhik Ranjan Das	H.S. 1 <sup>st</sup> yr.	Ch. Manikumar Singha	Smt. A. Joymoti Singha



**Name of the  
Vice-Presidents, General Secretaries and Editors  
of  
Students' Union of Radhamadhab College  
Since 1986 – 2014**

Vice President	General Secretary	Editor College Magazine	Year
Tapas Podder	Bidyut Singha	Ashit Dutta	1986-87
Biswajit Paul Choudhury	Uttam Kr. Paul	—	1987-88
Bidyut Singha	Tapadhir Chakraborty	—	1988-89
—	Jaydeep Samaddar	Anup Kumar Dey	1989-90
Pradip Sutradhar	Rupak Das	Anup Kumar Dey	1990-91
Sudip Chakraborty	Tapan Choudhury	Pradip Kumar Paul	1991-92
Rohit Nag	Debashish Chakraborty		1992-93
Avijit Deb	Ayan Choudhury	Satyajit Nath	1993-94
Debasish Chakraborty	Ayan Choudhury	Satyajit Nath	1994-95
Debashish Shome	Manabendra Dev	Anindya Sengupta	1996-97
—	Manabendra Dev	—	1997-98
—	Manabendra Dev	—	1998-99
Bikash Chakraborty	Bikash Das	Santosh Kumar Paul	1999-00
Debojit Biswas	Sangita Sharma	Santosh Deb Nath	2001-02
G.M. Rostom	Prabal Kanti Das	Subrata Choudhury	2002-03
Uttam Dev	Siddartha Dev	Shankar Prasad Chakraborty	2003-04
Projit Das	Rajdeep Adhikari	—	2004-05
Rajdeep Adhikari	Biswajit Chakraborty	Rosy Begum Choudhury	2005-06
Prova Malakar	Antu Banik	Debashish Das	2006-07
Angshuman Dey	Indrajit Charkaborty	Debashish Das	2008-09
Ellora Mukharjee	Monoj Kanti Das	Pradyut Das	2009-10
—	—	Rahul Anurag Bhattacharjee	2010-11
—	—	Amit Sutradhar	2011-12
Sankar Paul	Sambhu Das	Bhaskar Jyoti Das	2012-13
Sambhu Das	Bhaskar Jyoti Das	Dilu Das	2013-14



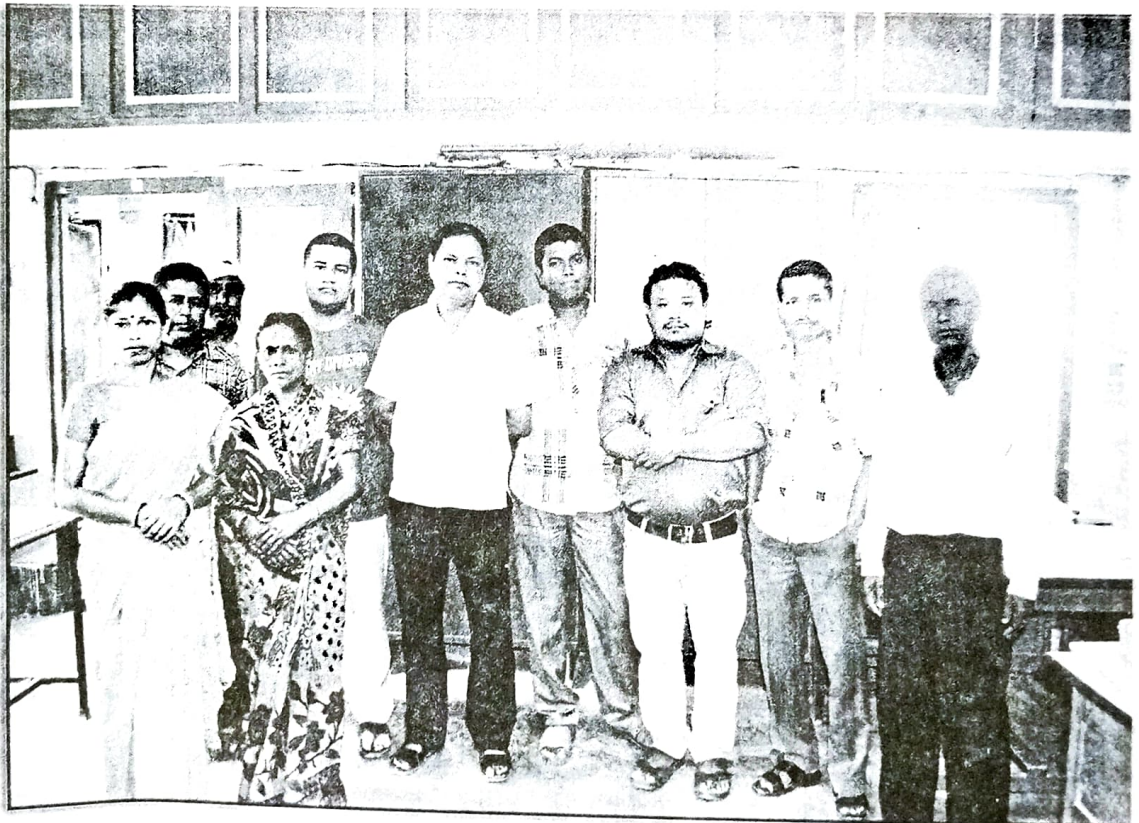
*Dr. Pronoy Ranjan Deb, Principal*



*Faculty Members of the Radhamadhab College, Silchar*



*Library Staff of the Radhamadhab College.*

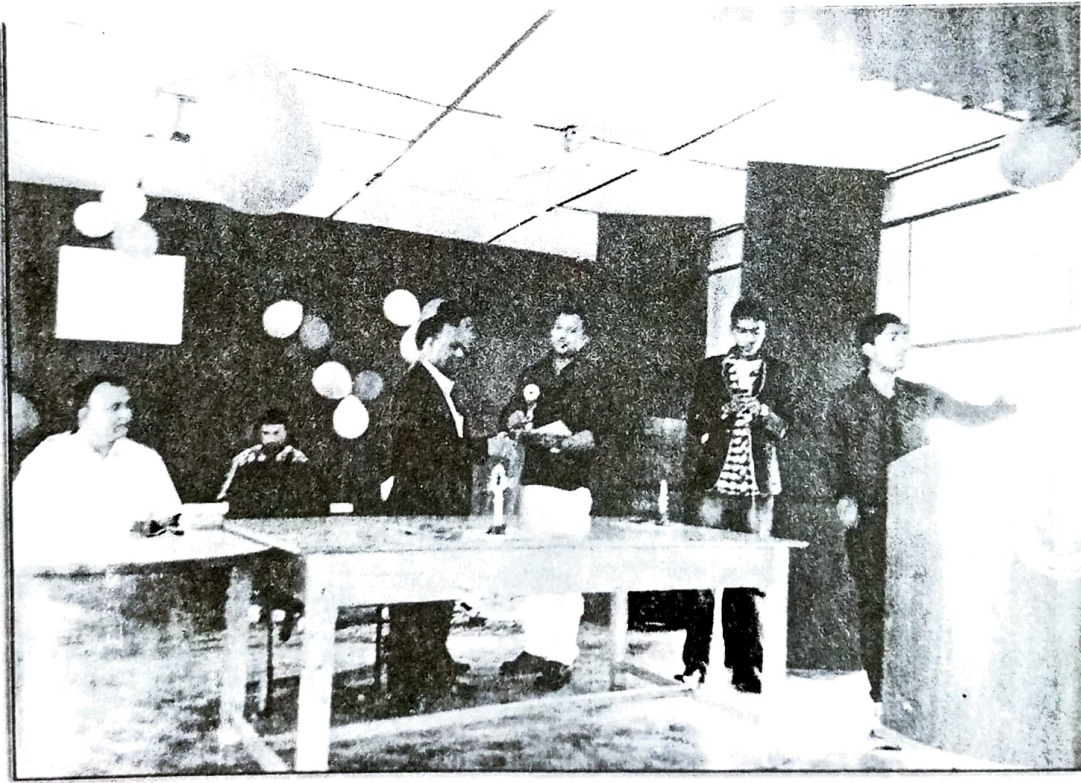
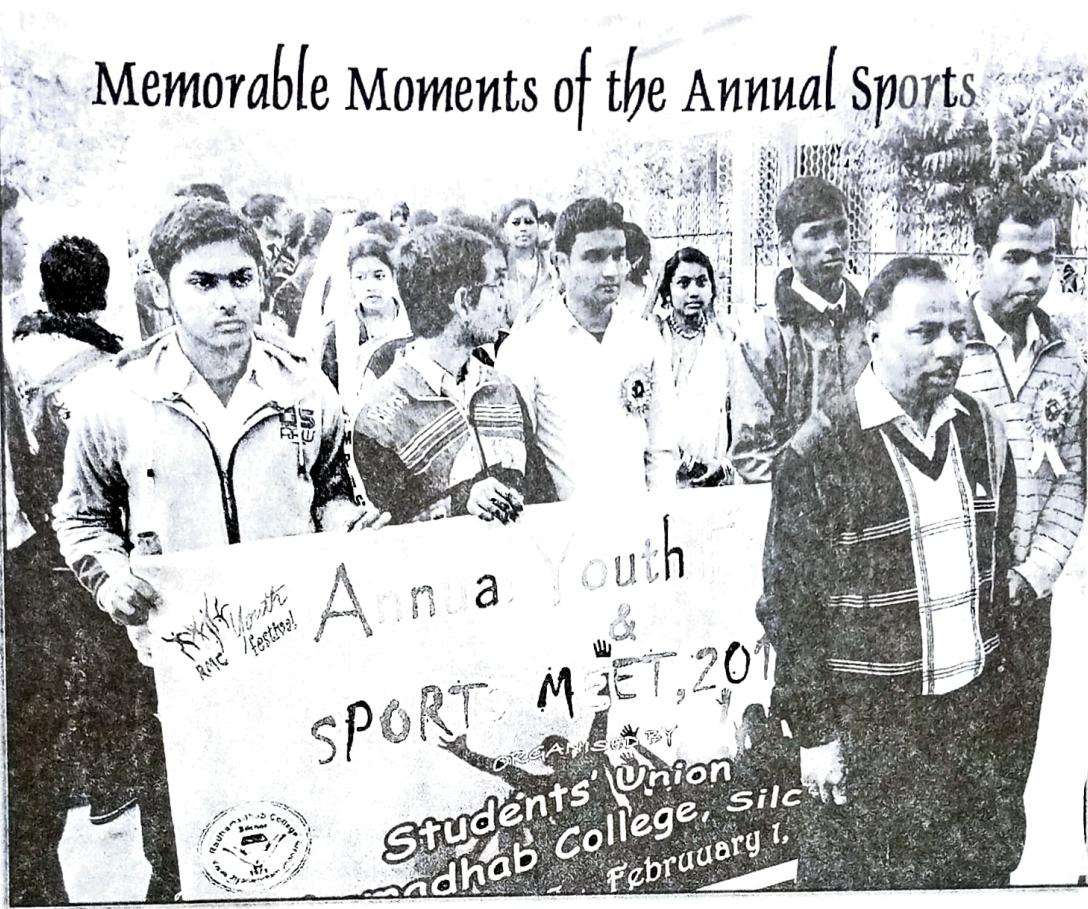


*Administrative Staff of the Radhamadhab College.*



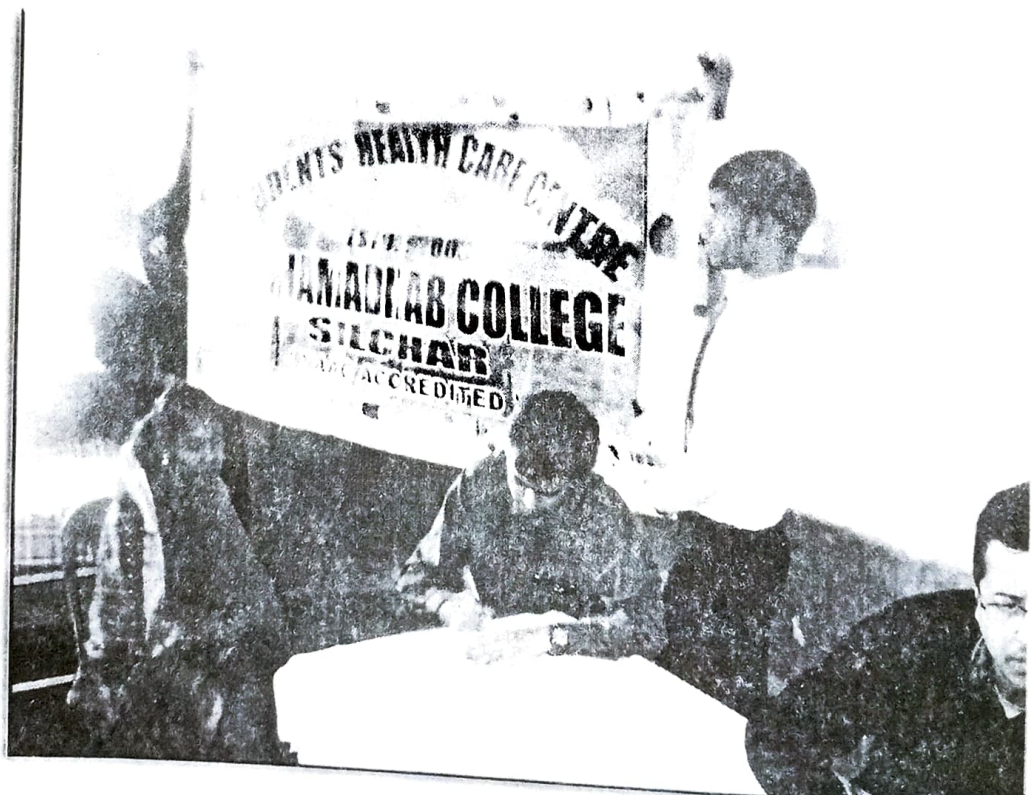


# Memorable Moments of the Annual Sports





*Alumni Association of the College.*



*Students' Health Care Centre, RMC.*



*Excursion tour of Radhamadhab College organised by Abhisarika holidays 01.01.2013*



*Yuva Sammelan at Ramkrishna Mission Silchar, 2014.*

# ISHANMADHUB JULLI

ESTD - 1971

HONORS - RAJANI KANTA SAHA, HRISHIKESH SAHA & SHEFALI KONAR SAHA



*Students' Union 2013-14*